গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ
বগুড়া জেলা

জরিপ গ্রন্থমালা-৩

গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ
বগুড়া জেলা

আহম্মেদ শরীফ

গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট

মু. গ. কেন্দ্র বই ক্রম-১৬
গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ গ্রন্থমালা

সম্পাদক
মুনতাসীর মামুন
মাহবুবর রহমান

সহযোগী সম্পাদক
আহম্মেদ শরীফ

©
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
[1971 : Genocide-Torture-Archive & Museum Trust]

প্রকাশ কাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রকাশক
প্রকাশনা কর্মকর্তা
গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
২৬ সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা
genocide71centre@gmail.com,archivemuseum1971@gmail.com
০৪১-৭৩৩৭৮৮, ০১৮৪১ ০০১১৯৯, ০১৮৪৩ ৩৭৭৭৩৩, ০১৭১৫ ৪৫৭৩৮২

মুদ্রণ : এম.বি প্রিন্টার্স, ২৮ টিপুসুলতান রোড, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ : আজিজ হাসান প্রচ্ছদ লিপি : হামিদুল ইসলাম

স্বত্ব : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র

পৃষ্ঠাবিন্যাস : পারফর্ম কম্পিউটারস, ১০৫ ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

পরিবেশক
সুবর্ণ ॥ বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৪৭১১৫৫৫৭, ০১৯১৮৮৬২৯৫২, ০১৭১২৭৯০৭১৯, bdsubarna@yahoo.com
জার্নিম্যান বুকস : রুম ৬, ১০ম তলা, ইস্টার্ণ প্লাজা, সোনারগাঁ রোড, ঢাকা ১২০৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৯৬৬২৪৭৯, ৯৬৬০২২৪, ৯৬৬২৮৮২, journeymanbooks@gmail.com

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-34-2820-0

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে মুদ্রিত হওয়ার কারণে গ্রন্থটির দাম কম রাখা হয়েছে

গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ
বগুড়া জেলা

সাদা

সূচি

গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে ৭
ভূমিকা ১১
প্রস্তাবনা ১৫
বগুড়া জেলার ভৌগোলিক পরিচয় ১৮
গণহত্যা ৪১
বধ্যভূমি ৬৯
গণকবর ৯৩
নির্যাতন কেন্দ্র ১০৭
শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর ১১৯
স্মৃতি সংরক্ষণ ও স্মারক ১৩১
মূল্যায়ন ১৩৬
উপসংহার ১৩৯
পরিশিষ্ট ১৫৫
গ্রন্থপঞ্জি ও সাক্ষাৎকার-এর তালিকা ২০২

গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে

গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র পরিকল্পিত নতুন গ্রন্থমালার নাম *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ*। এ জরিপের অন্তর্গত নির্যাতন কেন্দ্র ও শহিদের কবরও। কিন্তু শিরোনাম বেশি বড় হয়ে যায় এ কারণে শুধু গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ধরনের জরিপ প্রচলিত জরিপ থেকে ভিন্ন। আমরা যখন এ পরিকল্পনা নিই তখন যারা সরকারি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করেন তাদের সবাই বলেছিলেন, যে কোনো কোম্পানিকে কাজটি দিয়ে দিতে। না হলে অডিট ঝামেলা করে। আমার অভিজ্ঞতা হলো, ত্রুটি থাকুক না থাকুক অডিটকে সন্তুষ্ট করা দুরূহ। আমরা বলেছি, এটি তথা কথিত জরিপ নয়। এবং মুক্তিযুদ্ধ যিনি ভালোবাসেন এ রকম গবেষক দিয়েই কাজটি করাতে হবে। কারণ প্রতিটি জরিপের ক্ষেত্রে টাকা এতো কম যে ঐ টাকা দিয়ে জরিপ করানো যাবে না। এসব অনেক ব্যাপার আছে যা আলোচনা না-ই বা করলাম। আমরা চেয়েছি এ জরিপ সম্পন্ন করতে তাতে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে কিন্তু অর্থ-এর কোন বিষয় নেই।

এ জরিপের কাজ ছিল খুব দুরূহ। কারণ আমাদের সামনে কোন মডেল ছিল না, সামান্য অর্থ, আগ্রহী লোকের অভাব। আমরা সামান্য সম্বল নিয়ে কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো– স্মৃতির অবলেপন। এত বছর আগে সংঘটিত এসব ঘটনার কথা অনেকের মনে নেই, ঐ সময় যারা ছিলেন তাদের অনেকে বেঁচে নেই, অনেকে চলে গেছেন। স্বাধীনতাবিরোধীদের ভয় মানুষের মধ্যে এমন গেথে গেছে যে, অনেকে এইসব ঘটনার কথা বলতে চান না। অনেকের ব্যক্তিগত জমিতে ঘটনা ঘটেছে। অনেকে ঘটনাস্থল দখল করে স্থাপনা গড়েছেন, তারাও এসব ঘটনা ধামাচাপা দিতে চান। ফলে, এ ধরনের জরিপ সম্পূর্ণ নিখুঁত হবে তা ভাবা যায় না। আমরাও বলছি না আমাদের জরিপ একেবারে নিখুঁত।

জাতীয় ইতিহাসে এ জরিপের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা জানি জামায়াত, বিএনপি ও অনেক রাজনৈতিক দল ইতিহাসের স্বার্থে ৩০ লক্ষ গণহত্যাকে অস্বীকার করেছে। এ জরিপ প্রমাণ করছে আসলে প্রতিটি জেলায় কী ঘটেছিল। একটি উদাহরণ দিই– প্রচলিত ধারণা ছিল বগুড়া জেলায় আছে চৌদ্দ-পনেরটি বধ্যভূমি ও গণকবর। বর্তমান জরিপে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর, নির্যাতন কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৩টি। তাহলে গণহত্যার সংখ্যাটি কতো বেড়ে যায়? দশ-গুণেরও বেশি।

আরেকটি বিষয় বলা দরকার গণহত্যা-গণকবর-বধ্যভূমি-নির্যাতন কেন্দ্র পরস্পর যুক্ত। যেখানে গণহত্যা হয়েছে সেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত নিহতের সংখ্যা এখন আর জানা যাবে না। তখনও জানা সম্ভব ছিল না। গণহত্যার পর অনেক ক্ষেত্রে গণকবর দেয়া হয়েছে। বধ্যভূমিতে এনে গণহত্যা করা হয়েছে যা গণহত্যারই অন্তর্গত। নির্যাতন কেন্দ্রেও অনেকে নিহত হয়েছেন যাদের গণহত্যায় নিহত হিসেবে দেখান হয়নি। এ সমস্ত বিবেচনা করলে গণহত্যা ৩০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে।

এ জরিপে আমরা শহিদের তালিকা তৈরি করেছি যা বলাবাহুল্য অসম্পূর্ণ। তবুও চেষ্টা করেছি। কোথায় কোথায় শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর আছে তাও জরিপে আনতে চেয়েছি। বলাবাহুল্য অনেক কবর প্রাকৃতিক কারণে হারিয়ে গেছে বা স্মৃতি থেকে মুছে গেছে।

এ ধরনের জরিপ বাংলাদেশে প্রথম। এ জরিপ করা উচিত ছিল মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল বা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের। কমান্ড কাউন্সিলের কাজ কি জানি না, মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়নে ব্যস্ত থাকতে হয় মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়কে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কম বাজেট সত্ত্বেও তারা এ ধরনের কাজে উদ্যোগ নিয়েছে। সে জন্য মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ও এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই পরিকল্পনামন্ত্রী আ.হ.ম মোস্তফা কামাল ও তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কবি আসাদ মান্নানকে যারা এই পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করেছেন।

এই ধরনের জরিপ পরিচালনার জন্য অপেক্ষাকৃত তরুণ ও মুক্তিযুদ্ধে আগ্রহী গবেষকদের আমাদের বেছে নিতে হয়েছে যাতে অর্থ নয় কমিটমেন্টের কারণে তারা কাজটি করেন। আমরা তাতে অসফল হইনি তার প্রমাণ বর্তমান জরিপ।

তরুণ গবেষক আহম্মেদ শরীফ যথাসাধ্য পরিশ্রম করে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। ইতোমধ্যে গণহত্যা বিষয়ক তার ৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের সহকারি অধ্যাপক।

গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : বগুড়া জেলা শিরোনামে গ্রন্থটি আজ প্রকাশিত হয়েছে। ইতোমধ্যে নীলফামারী ও নারায়ণগঞ্জ জেলার জরিপ নিয়ে গ্রন্থমালার দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা চেষ্টা করব অর্থ সংকুলান হলে ৬৪টি জেলার জরিপ কাজ সম্পন্ন করতে। সর্বোচ্চ আদালতের রায় ও পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, এ সব স্মৃতিচিহ্নগুলি সংরক্ষণ করতে হবে যা সরকারের দায়িত্ব। প্রতিটি জেলার জরিপের ফল যদি প্রতিটি জেলার কর্মকর্তাদের প্রেরণ করা হয় তাহলে তাদের সঙ্গে সরকারের কাজটি করা সহজ হবে। তবে, আমরা মনে করি শুধু সরকার নয়, সাধারণ মানুষ, এনজিও, কলেজ, স্কুল, শিক্ষক-ছাত্র, তাদেরও এগিয়ে আসা উচিত এসব ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে।

মুনতাসীর মামুন
মাহবুবর রহমান

সাদা

ভূমিকা

পাকিস্তানি বাহিনির আক্রমণ ও নির্যাতনের চিহ্ন বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের দোসর ছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অবাঙালিরা। তাদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা-নির্যাতন, লুণ্ঠন-অগ্নিসংযোগ, শিশু ও নারী নির্যাতনের ব্যাপকতা হার মানায় বিশ্বের যে কোন নির্যাতন কর্মকাণ্ডকে। গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের এমন ঘটনা ঘটে বগুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ব্যাপক গণহত্যার সূচনা হয়। এরপর সারাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। বগুড়ার সাধারণ জনগণ ২৬ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরোধ করেছিল। কিন্তু এই কয়েক দিন পাকিস্তানি বাহিনি বারংবার বগুড়ার ওপর কর্তৃত্ব আনার চেষ্টা করে। ভারী অস্ত্র নিয়ে ১ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনি বগুড়ায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরপর থেকে নিরীহ মানুষজনকে বিভিন্ন জায়গায় হত্যা করা শুরু করে পাকিস্তানি বাহিনি। হত্যার পূর্বে পাকিস্তানি বাহিনি তাদের ওপর চালায় নির্মম নির্যাতন।

পাকিস্তানি বাহিনি বগুড়াবাসীর আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে সারা জেলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় একই সাথে প্রায় সারা দেশ পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের দোসররা দখল করে নেয়। মানসিকভাবে পাকিস্তানি বাহিনির উপর পুনঃআক্রমণের শক্তি-সাহস অর্জন না করা পর্যন্ত কোথাও বড় প্রতিরোধ সম্ভব হয়নি। ওই সময় স্বাধীনতার পক্ষের সকলে এলাকা ছেড়ে ভারতে অথবা আত্মগোপনে চলে গিয়েছিল। তাই ওই সময় যেসব আক্রমণের ঘটনাগুলো ঘটে তার বেশির ভাগই ছিল একতরফা। এতে আক্রমণকারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়– গণহত্যা-নির্যাতন।

মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*-এ বগুড়া জেলায় ২৫,০০০ জন মানুষকে হত্যার কথার বলা হয়েছে। ১৫৩টি গণহত্যার

নিদর্শন গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতন কেন্দ্রের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় বগুড়া জেলায় সংঘটিত গণহত্যা উল্লিখিত সংখ্যা থেকে কয়েকগুণ বেশি।

সারা দেশের মতো বগুড়া জেলায় হত্যা-নির্যাতনের গতি-প্রকৃতি কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া একই রকম। প্রথমে পাকিস্তানি বাহিনি দলবদ্ধভাবে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে লুট, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যা-নির্যাতন শেষে ধর্ষণ দিয়ে শেষ হয়েছে অপারেশন। পরবর্তী সময়ে এর ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানি সমর্থক অল্পসংখ্যক মানুষ ছাড়া সর্বস্তরের বাঙালি গণহত্যার শিকার হন। বগুড়ার বিভিন্ন এলাকায় এই রকম প্রক্রিয়ায় নির্যাতন করে পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের সহযোগী রাজাকাররা। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দলবদ্ধভাবে ভারতে আশ্রয় নেন বগুড়ার অনেক মানুষ। তারা গণহত্যার পর নিহত ও আহত ব্যক্তিদের কাছে ধন-সম্পত্তি লুট করে নেয়। বগুড়ার রামশহরে এক পীর পরিবারের সকল সদস্যকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে, যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পীর পরিবারগুলো পাকিস্তানি বাহিনির দোসর হিসেবে কাজ করে। এই পীর পরিবার মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক হওয়ায় তাদের হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনি।

শহিদের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য দেশের প্রত্যেকটি বধ্যভূমি ও গণকবরে স্মৃতিফলক বা স্তম্ভ নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। ইতোমধ্যে বহু স্থানে স্মৃতিফলক নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী খুলনা, বাগেরহাট ও ময়মনসিংহসহ সারা দেশে শহিদ স্মৃতির স্থানসমূহ চিহ্নিত করছে। '১৯৭১ : নির্যাতন-গণহত্যা আর্কাইভ ও জাদুঘরের' উদ্যোগে খুলনা অঞ্চলে অনেকগুলো গণহত্যার স্থানে স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে। সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে একাত্তরের স্মৃতি সংরক্ষণে নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যা ও নির্যাতনের তথ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে দেখেছি মানুষের মনে এখনো একাত্তর সালের সব ঘটনা জ্বলজ্বল করছে। একই সাথে গণহত্যা, নির্যাতন, বধ্যভূমি সম্পর্কে

সকলের কিছুটা মৌনতাও লক্ষণীয়। এই সব নিয়ে তারা মুখ খুলতে নারাজ। কারণ ওই সব গণহত্যার হোতারা এখনো সমাজে বেশ দাপটশালী। তাছাড়া দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই কষ্টগুলোকে ভুক্তভোগীরা স্মৃতিচারণে তুলে ধরতে চান না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা বিস্মৃতও হয়েছেন। এই সব ঘটনার অন্যান্য যারা সাক্ষী ছিলেন তাদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। ফলে যত সময় যাবে প্রত্যক্ষদর্শীর সংখ্যা ততই কমে যাবে। আমাদের উচিত নিজ নিজ এলাকায় প্রবীণ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করে রাখা।

এই জরিপ কার্যের আমি ক্যামেরা ব্যবহার করেছি। চেষ্টা করেছি ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সকলের বক্তব্য গ্রহণ করতে। গণহত্যা থেকে ভাগ্যক্রমে যাঁরা বেঁচে ফিরে আসেন তাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।

বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমি পূর্ব থেকেই কাজ করছি। আমার স্বপ্ন ছিল এই জেলার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি বড় কাজ করার। কিন্তু অর্থের অভাবে তা সম্ভব হয়নি। আমি খুলনায় অবস্থিত 'গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রে'র নিকট এই গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য সহায়তার অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করি। প্রতিষ্ঠানটি আমার আবেদন মঞ্জুর করায় আমার পক্ষে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই জরিপের কাজে আমাকে যেতে হয়েছে বগুড়া জেলার প্রত্যন্ত এলাকায়। কারণ বগুড়া জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনি গণহত্যা সংঘটিত করে। এই কাজে আমি যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে আজিজুল হক কলেজের ছাত্র, বর্তমানে মহাস্থান মাহীসাওয়াল কলেজের ইতিহাসের দুইজন প্রভাষক সজিবুল ইসলাম সবুজ ও আরিফ এবং রাজু। এছাড়া জরিপে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন– হাফিজুর রহমান ডালিম, শাহজাহান সূজা ও আলী হাসান সোহেল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. হারুন-অর-রশিদ গবেষণায় প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহিত করে যাচ্ছেন। আমি তাঁর প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

যাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা ছাড়া আমার লেখক সত্তা পরিস্ফূটিত হতো না, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষিক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন। যাঁর আদেশ আমার কাছে শিরোধার্য এবং নির্দেশনা বেদ বাক্য। তাঁর প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ফাল্গুন ১৪২৪

আহম্মেদ শরীফ
ahmmed_shorif@yahoo.com

প্রস্তাবনা

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বগুড়া জেলার ১২টি উপজেলায় ব্যাপক ও বিভৎস গণহত্যা চালায়। পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল বদর, আল শামস ও বিহারি সম্প্রদায় এ গণহত্যায় নেতৃত্ব দেয়। গণহত্যার সাক্ষী হয়ে সারা জেলায় আজও দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। অনেক বধ্যভূমি বেদখল হয়েছে ভূমিদস্যু ও স্বাধীনতা বিরোধীদের দ্বারা। এই জরিপ কর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে পরিচিত গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবরের পাশাপশি বেশ কিছু নতুন বধ্যভূমি ও গণকবরের অনুসন্ধান পাওয়া গেছে। এই বধ্যভূমিগুলোতে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সমার্থক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এসে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করা হতো। আলোচ্য জরিপে বগুড়া জেলার ১২টি উপজেলায় ১৯৭১ সালের সংঘটিত গণহত্যা ও তার নিদর্শন বধ্যভূমি, গণকবর এবং শহিদের কবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেগুলো অনুসন্ধান করে তুলে ধারা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক, প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিমূলক লেখা ও সাক্ষাৎকার, মাঠ পর্যায়ে তথ্যানুসন্ধান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে রচিত গ্রন্থ এবং মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র মাধ্যমে এই জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধ কোষ দ্বিতীয় খণ্ড*-এ মোট ৯০৫টি গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতন কেন্দ্রের তালিকা তুলে ধরেছেন যা এ যাবৎকালের সবথেকে বড় সংগ্রহ। কিন্তু সেটা স্বয়ংসম্পূর্ণ না। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক মামুন সিদ্দিকী এক প্রবন্ধে কুমিল্লা জেলার ৫৫টি গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের তালিকা তুলে ধরেছেন।[১] আহম্মেদ শরীফের 'নীলফামারী জেলা গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ'-এ নীলফামারীর ৮৯টি গণহত্যার নিদর্শনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এভাবে যদি প্রত্যেক জেলায় গড়

৫০টি গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে তা হলে বাংলাদেশে প্রায় ৩২০০টি গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের নিদর্শন পাওয়ার কথা। তাই আমাদের এখনই সারাদেশে গবেষণা পরিচালনা করা উচিত যাতে মুক্তিযুদ্ধের এই সব নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় এবং সংরক্ষণ করা যায়।

বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা হয় নি। তাই আমরা বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের গ্রন্থে এই জেলার গণহত্যা ও গণহত্যার নিদর্শন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারিনা। ডা. এম এ হাসানের *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ* গ্রন্থে বগুড়া জেলায় ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যা ও গণহত্যার নিদর্শন বধ্যভূমি, গণকবর ও শহিদদের কবর তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি মোট ৬টি বধ্যভূমি ও গণকবরে কথা তুলে ধরেছেন। সেগুলো হলো– ১. চেলপাড়া শান্তি নার্সারী, ২. চেলপাড়া কুয়ো, ৩ সুখান পুকুরের একটি গ্রাম, ৪. ভার্জিনিয়া টোব্যাকো মিল চত্বর,[২] ৫. গাঙ্গুলি বাগান, ৬. আমতলা গণকবর।[৩]

ড. মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ* দ্বিতীয় খণ্ডে বগুড়া জেলায় ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যা ও গণহত্যার নিদর্শন বধ্যভূমি, গণকবর ও শহিদের কবরের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই কোষ গ্রন্থে তিনি মোট ১৪টি বধ্যভূমি ও গণকবরে কথা তুলে ধরেছেন। সেগুলো হলো– ১. আমলতা গণকবর,[৪] ২. গাঙ্গুলি বাগান বধ্যভূমি,[৫] ৩. চেলপাড়া শান্তি নার্সারি গণকবর,[৬] ৪. চেলপাড়া কুয়ো বধ্যভূমি,[৭] ৫. ডিগ্রি কলেজ গণকবর,[৮] ৬. তালোর বন্দর নির্যাতন কেন্দ্র ও গণহত্যা,[৯] ৭. দুপচাঁচিয়া,[১০] ৮ নারুলীপাড়া ও চেলোপাড়া রেলক্রসিং গণহত্যা,[১১] ৯. বগুড়া সদর গণহত্যা,[১২] ১০. বগুড়ার বিভিন্ন গ্রামের গণহত্যা ও গণকবর,[১৩] ১১. ভার্জিনিয়া টোব্যাকো মিল গণকবর ও বধ্যভূমি,[১৪] ১২. রামশহর গণকবর,[১৫] ১৩. সুখান পুকুর গণহত্যা[১৬] ও ১৪. ময়েন সোনার ঘাট বধ্যভূমি[১৭]। এছাড়া আঞ্চলিকভাবে রচিত সেলিনা শিউলীর *বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে ১৯৭১ সালে বগুড়া জেলায় সংঘটিত গণহত্যার ১৪টি নিদর্শনের কথা তুলে ধরেছেন। সেগুলো

হলো– ১. বগুড়া গণহত্যা,[১৮] ২. শেরপুর বাগড়া কলোনি হত্যাযজ্ঞ,[১৯] ৩. শিবগঞ্জের মজুমদারপাড়া বধ্যভূমি,[২০] ৪. মালদা বধ্যভূমি,[২১] ৫. লিচুতলার বধ্যভূমি,[২২] ৬. আড়িয়াবাজার বধ্যভূমি,[২৩] ৭. ধুনট বধ্যভূমি,[২৪] ৮. বগুড়ায় পাকিস্তানি বাহিনির গণহত্যা,[২৫] ৯. এসপির বাগান বধ্যভূমি,[২৬] ১০. সাধুর আশ্রম,[২৭] ১১. এস.ডি.ও'র বাংলো বধ্যভূমি,[২৮] ১২. বগুড়া রেলস্টেশন : জল্লাদের কসাইখানা বধ্যভূমি,[২৯] ১৩. চকলোকমান বধ্যভূমি[৩০] ও ১৪. দড়িমুকুন্দ বধ্যভূমি[৩১]। এই তিনটি গ্রন্থে ১৯৭১ সালের সংঘটিত গণহত্যা ও তার নিদর্শন বধ্যভূমি, গণকবর এবং শহিদের কবর সম্পর্কে যে তথ্য গুলো পাওয়া গেছে তা বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার ইতিহাস পুর্ণগঠন করা সম্ভব হয়নি। এ জরিপের লক্ষ্য হলো বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার ইতিহাস পুর্ণগঠন করা।

বগুড়া জেলার ভৌগোলিক পরিচয়

বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। পুণ্ড্র একটি প্রাচীন জাতিমূলক নাম।[৩২] এর নামকরণ হয়েছে পুণ্ড্র জনগোষ্ঠীর নামানুসারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (খ্রি.পূ. ৮ম শতাব্দী) প্রথমবারের মতো উপজাতি গোষ্ঠীরূপে পুণ্ড্রের উল্লেখ রয়েছে। অন্ধ্রথ, শবর, পুলিন্দ ও মুতিব জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে পুণ্ড্ররা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অন্যান্য সাহিত্যসূত্রেও নামটি পাওয়া যায়।[৩৩] এরা উত্তরবঙ্গে বাস করতো বলে এই অঞ্চল পুণ্ড্রদেশ ও পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত ছিল।[৩৪] পুণ্ড্রনগর ছিল একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র।[৩৫] ভবিষ্যৎ পুরাণে বলা হয়েছে যে নিম্নলিখিত সাতটি দেশ পুণ্ড্র দেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল– ১. গৌড়; ২. বরেন্দ্র; ৩. নীবিত, ৪. সূহ্ম, ৫.ঝারিখণ্ড (সাঁওতাল পরগনা); ৬. বরাহভূমি (মানভূম জিলার বরাভূম); এবং ৭. বর্ধমান।[৩৬]

দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে গঙ্গা এবং পূর্বে করতোয়া অথবা যমুনা দ্বারা পরিবেষ্টিত পুণ্ড্র, পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রবর্ধন নামে আখ্যায়িত অঞ্চলটি বাংলাদেশের রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর (ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের অন্তর্গত) এবং প্রাচীন বরেন্দ্র নিয়ে গঠিত ছিল। বুধগুপ্তের রাজত্বকালের (আনু. ৪৭৬-৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) দামোদরপুর তাম্রশাসন অনুসারে পুণ্ড্রবর্ধনের উত্তর-সীমা ছিল হিমালয় (হিমাবচ্ছিখর)।[৩৭]

পরবর্তীকালে রাঢ় ও দণ্ডভুক্তি সমন্বয়ে গঠিত বাংলার পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত প্রায় সমগ্র বাংলা পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রবর্ধনের আখ্যাধীনে চলে আসে।[৩৮] লেখতাত্ত্বিক সূত্রের তুলনামূলক গবেষণা থেকে এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। ভাগীরথীর পূর্বাঞ্চল পুণ্ড্রবর্ধনরূপে উল্লিখিত হলেও এর পশ্চিমাঞ্চল অনুরূপ নামে উল্লিখিত নয়।[৩৯]

চীনের সঙ্গে মগধের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলের উপর পুণ্ড্রবর্ধনের অবস্থিতি এর গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়।[৪০]

করতোয়ামাহাত্ম্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পুণ্ড্রনগর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থল হিসেবে বিদ্যমান ছিল।[৪১] মধ্যযুগে পুণ্ড্রনগর এবং এর সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। এ সময় অঞ্চলটি মহাস্থান নামে আখ্যাত হয় [সুচন্দ্রা ঘোষ]।[৪২] পুণ্ড্রদেশের রাজধানীর নামও ছিল পুণ্ড্রবর্ধন।[৪৩]

১২৮১ খৃস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন বাংলার স্বাধীন সুলতান মুগীসউদ্দীন তুঘরলকে পরাজিত করে পুনরায় বাংলার মুসলিম রাজ্যকে দিল্লীর শাসনাধীনে নিয়ে আসেন এবং স্বীয় পুত্র বুঘরা খানী[৪৪]কে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।[৪৫] বুঘরা খানের নাম অনুসারে বগুড়া জেলার নামকরণ হয় বলে ধারণা করা হয়।

বগুড়া প্রশাসন জেলা-শহর (টাউন কমিটি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫০ সালে। টাউন কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন ডব্লিব ওয়াভেল।[৪৬] বগুড়া পৌরসভা গঠিত হয় ১৮৮৪ সালে। রাজশাহী জেলার ৪টি থানা (আদমদীঘি, বগুড়া, শেরপুর ও নওখিল), দিনাজপুরের ৩টি থানা (লালবাজার, বদলগাছী ও ক্ষেতলাল) এবং রংপুরের ২টি থানাসহ (গোবিন্দগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ) মোট নয়টি থানা নিয়ে ১৮২১ সালে বগুড়া জেলা গঠিত হয়। পরবর্তীকালে জেলার প্রাথমিক কাঠামো থেকে ৯টি থানা বাদ দিয়ে নতুন সাতটি থানা সংযোজন করে বৃহত্তর বগুড়া জেলা গঠন করা হয়।[৪৭] তখন জেলার দায়িত্বে ছিলেন একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। পরবর্তীকালে ১৮৩২ সালে পূর্ণাঙ্গ কালেক্টরেটে পরিণত হয় বগুড়া জেলা। এ সময় থেকে একজন ডেপুটি কালেক্টরেট দায়িত্ব পালন করেন। জেলার প্রথম প্রশাসক ছিলেন মিস্টার ব্যান্ডেল। তিনি ১৮২১ থেকে ১৮২৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।[৪৮] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীনের আগে বর্তমানের জয়পুরহাট জেলাও বগুড়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময়ে বগুড়ায় থানার সংখ্যা ছিল ১৩টি। এগুলো হলো– বগুড়া,

শিবগঞ্জ, ক্ষেতলাল, পাঁপবিবি, জয়পুরহাট, আদমদীঘি, দুপচাঁচিয়া, নন্দীগ্রাম, শেরপুর, ধুনট এবং সারিয়াকান্দি।[৪৯] বর্তমানে বগুড়া জেলার মোট উপজেলা ১২টি। উপজেলাগুলো হলো– আদমদীঘি, কাহালু, গাবতলী, দুপচাঁচিয়া, ধুনট, নন্দীগ্রাম, বগুড়া সদর, শাজাহানপুর, শিবগঞ্জ, শেরপুর, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা। এই ১২টি উপজেলায় রয়েছে মোট ১০৮টি ইউনিয়ন। বগুড়া জেলাকে ভাগ করে ১৯৮৩ সালে জয়পুরহাট জেলা গঠিত হয়।[৫০] বর্তমানে জেলায় মোট ১১টি পৌরসভা রয়েছে। পৌরসভাগুলো হলো– বগুড়া সদর পৌরসভা, নন্দীগ্রাম, ধুনট, গাপতলী, দুপচাঁচিয়া, সোনাতলা, কাহালু, সান্তাহার, সারিয়াকান্দি, শিবগঞ্জ এবং শেরপুর পৌরসভা।[৫১]

বগুড়া রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা। এই জেলার বর্তমান আয়তন ২৮৯৫.০১ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমান অবস্থান ২৪°৩২´ থেকে ২৫°০৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫৮´ থেকে ৮৯°৪৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। বগুড়া জেলার চারদিকে ঘিরে আছে উত্তরে জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা জেলা, দক্ষিণে নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলা, পূর্বে যমুনা নদী ও জামালপুর জেলা, পশ্চিমে নওগাঁ ও নাটোর জেলা।

বর্তমান বগুড়া জেলার আদমদীঘি, কাহালু, গাবতলী, দুপচাঁচিয়া, ধুনট, নন্দীগ্রাম, বগুড়া সদর, শাজাহানপুর, শিবগঞ্জ, শেরপুর, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা উপজেলায় মক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যা ও তার নিদর্শন বধ্যভূমি, গণকবর, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর ও নির্যাতন কেন্দ্র সম্পর্কে যে তথ্যগুলো পাওয়া গেছে আলোচ্য জরিপে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।[৫২]

বগুড়া জেলার ১২টি উপজেলা

বগুড়া জেলার উপজেলাগুলো হলো–

বগুড়া সদর, ধুনট, আদমদীঘি, কাহালু, গাবতলী, দুপচাঁচিয়া, নন্দীগ্রাম, শাজাহানপুর, শিবগঞ্জ, শেরপুর, সারিয়াকান্দি ।

বগুড়া জেলার মানচিত্র সৌজন্যে : *বাংলাপিডিয়া*

বগুড়া সদর উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

১৯৮৩ সালের ১ ডিসেম্বর বগুড়া সদর উপজেলা গঠিত হয় । বগুড়া সদর উপজেলা জনসংখ্যার দিক থেকে প্রথম এবং আয়তনের দিক থেকে নবম ।

আয়তন ও অবস্থান : বগুড়া সদর উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ৪,৫৯,৭১২ এবং আয়তন ১৭৯.১২ বর্গ কিলোমিটার । এর বর্তমান অবস্থান ২৪°৪১´ থেকে ২৪°৫৯´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°১৬´ থেকে ৮৯°৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ।

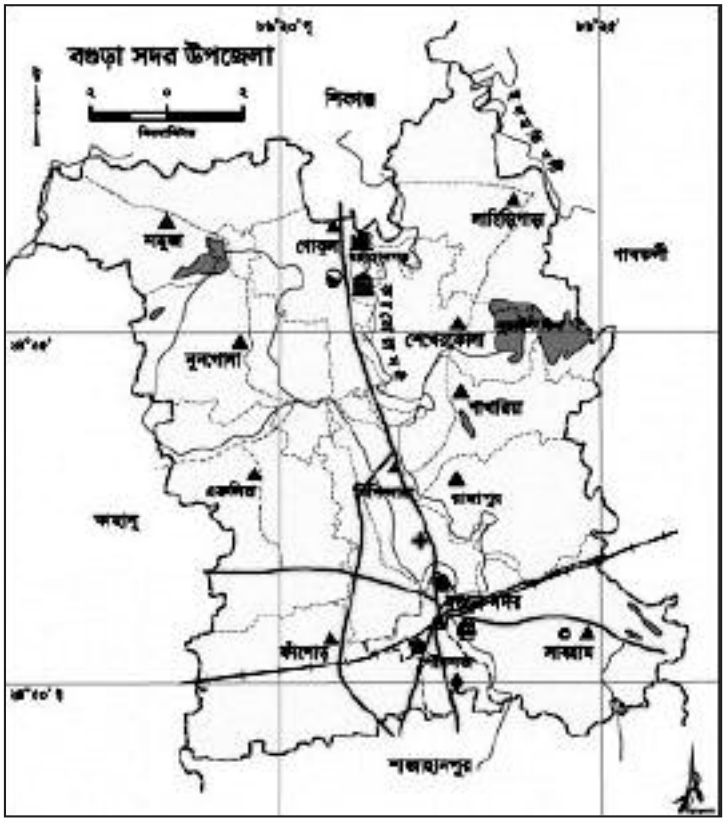

বগুড়া সদর উপজেলার মানচিত্র সৌজন্যে : *বাংলাপিডিয়া*

সীমানা : বগুড়া সদর উপজেলার উত্তরে শিবগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে শাজাহানপুর উপজেলা, পূর্বে গাবতলী, পশ্চিমে কাহালু উপজেলা অবস্থিত ।

নদী : বগুড়া সদর উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– করতোয়া ও ইছামতি নদী । এছাড়া নুরাইল বিল উল্লেখযোগ্য একটি জলাশয় ।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : বগুড়ার সদর উপজেলা মোট ১১টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। বগুড়ার সদর উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– এরুলিয়া, গোকুল, নামুজা, নিশিন্দারা, নুনগোলা, ফাঁপোড়, রাজাপুর, লাহিড়িপাড়া, শাখারিয়া, শেখেরকোলা, সাবগ্রাম। বগুড়া সদর উপজেলায় ১২টি ওয়ার্ড, ১৩৯টি মৌজা এবং ২০৮টি গ্রাম রয়েছে।[৫৩]

ধুনট উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

ধুনট থানা গঠিত হয় ১৯৬২ সালে এবং থানা থেকে উপজেলায় রূপান্তরিত হয় ১৯৮৩ সালে। ধুনট উপজেলা জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে পঞ্চম।

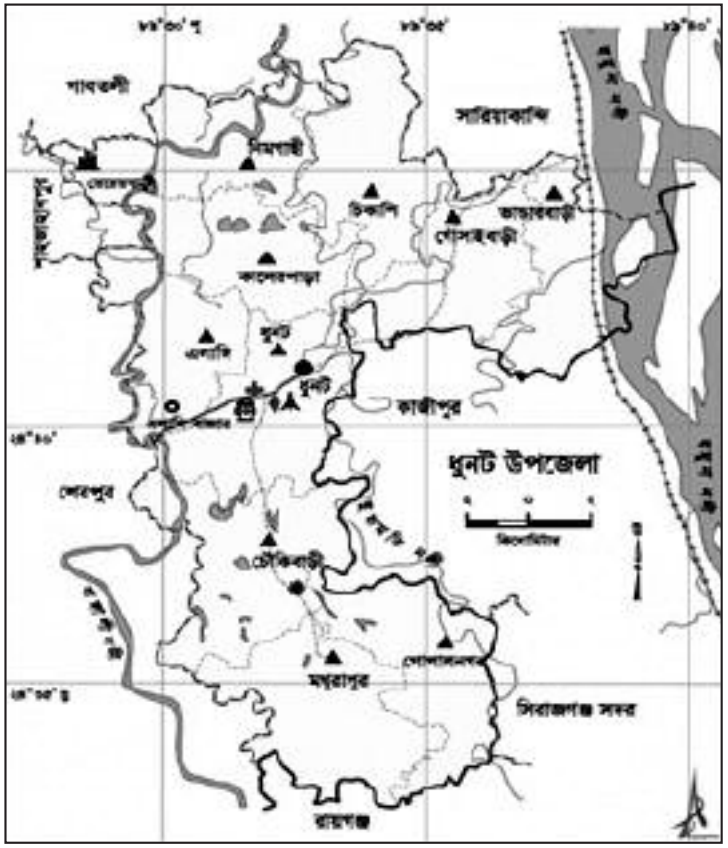

ধুনট উপজেলার মানচিত্র সৌজন্যে : *বাংলাপিডিয়া*

আয়তন ও অবস্থান : ধুনট উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ২৭০৮১০ এবং আয়তন ২৪৭.৭৩ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার বর্তমান অবস্থান ২৪°৩২′ থেকে ২৪°৪৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২৮′ থেকে ৮৯°৪০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা : ধুনট উপজেলার উত্তরে গাবতলী ও সারিয়াকান্দি উপজেলা, দক্ষিণে রায়গঞ্জ উপজেলা, পূর্বে কাজীপুর ও সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা, পশ্চিমে শাহজাহানপুর ও শেরপুর উপজেলা অবস্থিত।

নদী : ধুনট উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– যমুনা, বাঙালি ও ইছামতী নদী।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : ধুনট উপজেলা মোট ১০টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। ধুনট উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– এলাঙ্গী, কালেরপাড়া, গোপালনগর, গোসাইবাড়ী, চিকাশী, চৌকিবাড়ী, ধুনট, নিমগাছী, ভান্ডারবাড়ী, মথুরাপুর। ধুনট উপজেলায় ৯১টি মৌজা এবং ২১০টি গ্রাম রয়েছে।[৫৪]

দুপচাঁচিয়া উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

দুপচাঁচিয়া থানা গঠিত হয় ১৮৮০ সালে এবং থানা থেকে উপজেলায় রূপান্তরিত হয় ১৯৮৩ সালে। দুপচাঁচিয়া পৌরসভা গঠিত হয় ২০০০ সালে। দুপচাঁচিয়া উপজেলা জনসংখ্যার দিক থেকে বারতম এবং আয়তনের দিক থেকে এগারতম।

আয়তন ও অবস্থান : দুপচাঁচিয়া উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ১৬০৮৯৪ এবং আয়তন ১৬২.৪৫ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার বর্তমান অবস্থান ২৪°৪৮′ থেকে ২৪°৫৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°০৫′ থেকে ৮৯°১৩′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা : দুপচাঁচিয়া উপজেলার উত্তরে জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলা, দক্ষিণে আদমদীঘি ও কাহালু উপজেলা, পূর্বে শিবগঞ্জ ও কাহালু উপজেলা, পশ্চিমে আদমদীঘি ও আক্কেলপুর উপজেলা অবস্থিত।

নদী : দুপচাঁচিয়া উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– ইছামতি, নাগর নদী।

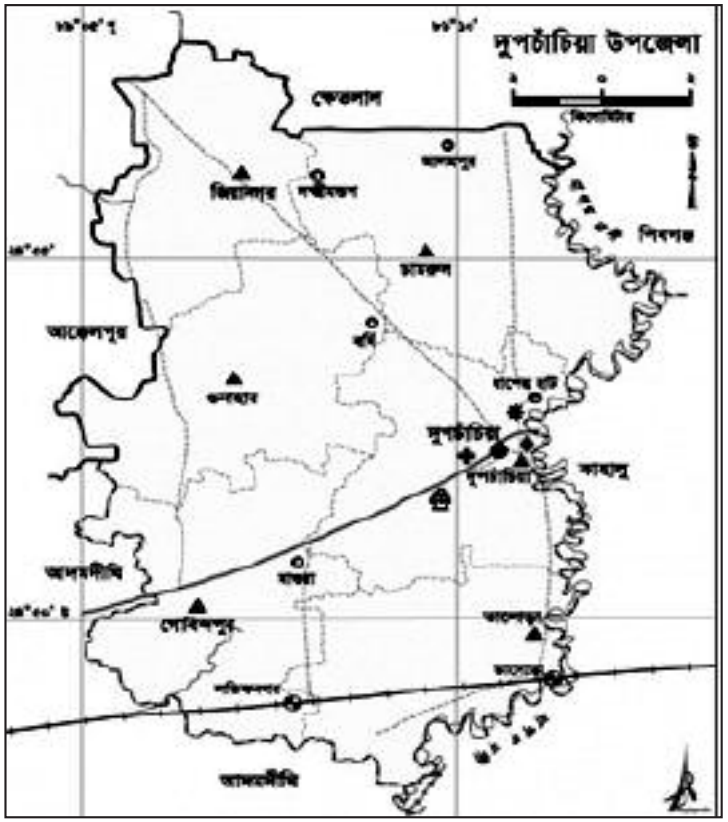

দুপচাঁচিয়া উপজেলার মানচিত্র *সৌজন্যে : বাংলাপিডিয়া*

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : দুপচাঁচিয়া উপজেলা মোট ৬টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। দুপচাঁচিয়া উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– গুনাহার, গোবিন্দপুর, চামরুল, জিয়ানগর, তালোড়া, দুপচাঁচিয়া। দুপচাঁচিয়া উপজেলায় ৯টি ওয়ার্ড, ১১৫টি মৌজা এবং ২১২টি গ্রাম রয়েছে।[৫৫]

গাবতলী উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

গাবতলীকে থানা গাঠিত হয় ১৯১৪ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। গাবতলী উপজেলা জনসংখ্যার দিক

থেকে তৃতীয় এবং আয়তনের দিক থেকে ষষ্ঠ।

আয়তন ও অবস্থান : গাবতলী উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ২৯০১৯০ এবং আয়তন ২৩৯.৬০ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার বর্তমান অবস্থান ২৪°৪৬′ থেকে ২৫°০১′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২২′ থেকে ৮৯°৩৩′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

গাবতলী উপজেলার মানচিত্র *সৌজন্যে : বাংলাপিডিয়া*

সীমানা : গাবতলী উপজেলার উত্তরে শিবগঞ্জ (বগুড়া) ও সোনাতলা উপজেলা, দক্ষিণে ধুনট উপজেলা, পূর্বে সারিয়াকান্দি উপজেলা, পশ্চিমে বগুড়া সদর ও শাহজাহানপুর উপজেলা অবস্থিত।

নদী : গাবতলী উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– ইছামতি, বাঙ্গালী ও সুখদহ নদী। এছাড়া কাটলাহার বিল, ডুমার বিল, চরার বিল ও উনচুকি বিল উল্লেখযোগ্য।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : গাবতলী উপজেলা মোট ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। গাবতলী উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– কাগইল, গাবতলী, দক্ষিণপাড়া, দুর্গাহাটা, নসিপুর, নরুয়ামালা, নেপালতলী, বালিয়াদীঘি, মহিষাবন, রামেশ্বরপুর, সোনারাই। গাবতলী উপজেলায় ১০৬টি মৌজা এবং ২১৪টি গ্রাম রয়েছে।[৫৬]

কাহালু উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

কাহালু থানা গঠিত হয় ১৯২৮ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। কাহালু উপজেলা জনসংখ্যার দিক থেকে অষ্টম এবং আয়তনের দিক থেকে সপ্তম।

আয়তন ও অবস্থান : কাহালু উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ১৯৫৫৬৫ এবং আয়তন ২৩৮.৭৯ বর্গ কিলোমিটার। কাহালু উপজেলার বর্তমান অবস্থান ২৪°৪৩´ থেকে ২৪°৫৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°০৯´ থেকে ৮৯°১৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা : কাহালু উপজেলার উত্তরে শিবগঞ্জ ও বগুড়া সদর উপজেলা, দক্ষিণে নন্দীগ্রাম উপজেলা, পূর্বে বগুড়া সদর ও শাহজাহানপুর উপজেলা, পশ্চিমে আদমদীঘি ও দুপচাঁচিয়া উপজেলা অবস্থিত ।

নদী : কাহালু উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– নাগর নদী।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : কাহালু উপজেলা মোট ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। কাহালু উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– কালাইমাঝপাড়া, কাহালু, জামগাঁও, দূর্গাপুর, নারহট্ট, পাইকার, বীরকেদার, মালঞ্চ, মুরাইল। উপজেলায় ১৬৭টি মৌজা এবং ২৭০টি গ্রাম রয়েছে।[৫৭]

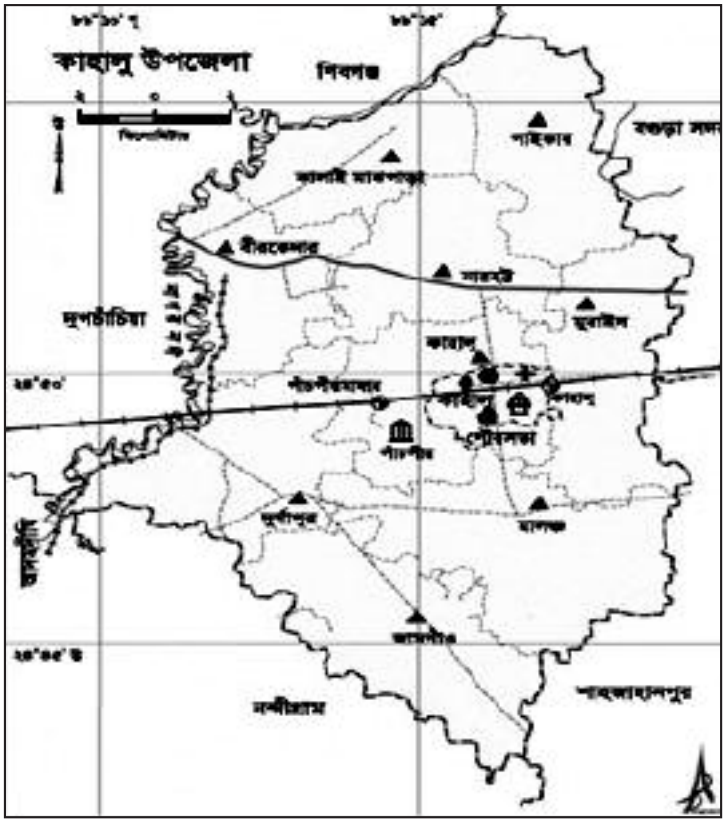

কাহালু উপজেলার মানচিত্র সৌজন্যে : *বাংলাপিডিয়া*

নন্দীগ্রাম উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

নন্দীগ্রাম থানা গঠিত হয় ১৯৩২ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। নন্দীগ্রাম উপজেলা জনসংখ্যার দিক থেকে দশম এবং আয়তনের দিক থেকে চতুর্থ।

আয়তন ও অবস্থান : নন্দীগ্রাম উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ১৬৮১৫৫ এবং আয়তন ২৬৫.৪৭ বর্গ কিলোমিটার। নন্দীগ্রাম উপজেলার বর্তমান অবস্থান ২৪°৩৫´ থেকে ২৪°৪৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°০৮´ থেকে ৮৯°২১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা : নন্দীগ্রাম উপজেলার উত্তরে শাহজাহানপুর ও কাহালু উপজেলা, দক্ষিণে সিংড়া উপজেলা, পূর্বে শেরপুর (বগুড়া) উপজেলা, পশ্চিমে আদমদীঘি, রানীনগর ও সিংড়া উপজেলা অবস্থিত ।

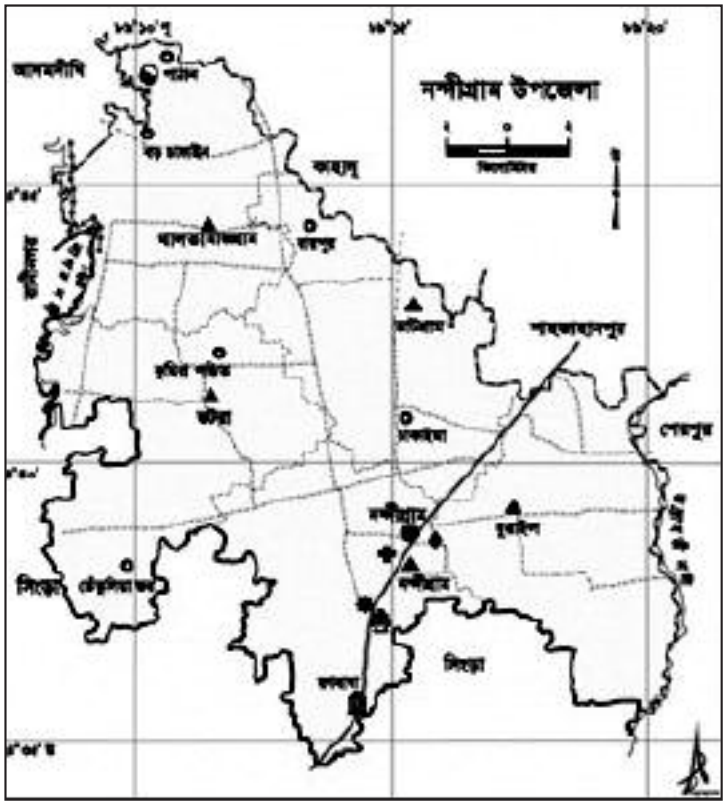

নন্দীগ্রাম উপজেলার মানচিত্র সৌজন্যে : *বাংলাপিডিয়া*

নদী : নন্দীগ্রাম উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– নাগর, ভদ্রাবতী নদী ।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : নন্দীগ্রাম উপজেলা মোট ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত । নন্দীগ্রাম উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– থালতা মাজগ্রাম, নন্দীগ্রাম, বুড়ইল, ভাটগ্রাম, ভাটরা । উপজেলায় ২৩৫টি মৌজা এবং ২৪৫টি গ্রাম রয়েছে ।[৫৮]

শাজাহানপুর উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

শাজাহানপুর উপজেলা ২০০৩ সালের ২১ জানুয়ারি গঠিত হয় । এ উপজেলা জনসংখ্যার দিক থেকে সপ্তম এবং আয়তনের দিক থেকে অষ্টম ।

আয়তন ও অবস্থান : শাজাহানপুর উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ২৩৪৩৬৫ এবং আয়তন ২১৫.৬৪ বর্গ কিলোমিটার । শাজাহানপুর উপজেলার বর্তমান অবস্থান ২৪°৪১´ থেকে ২৪°৫০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°১৬´ থেকে ৮৯°২৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ।

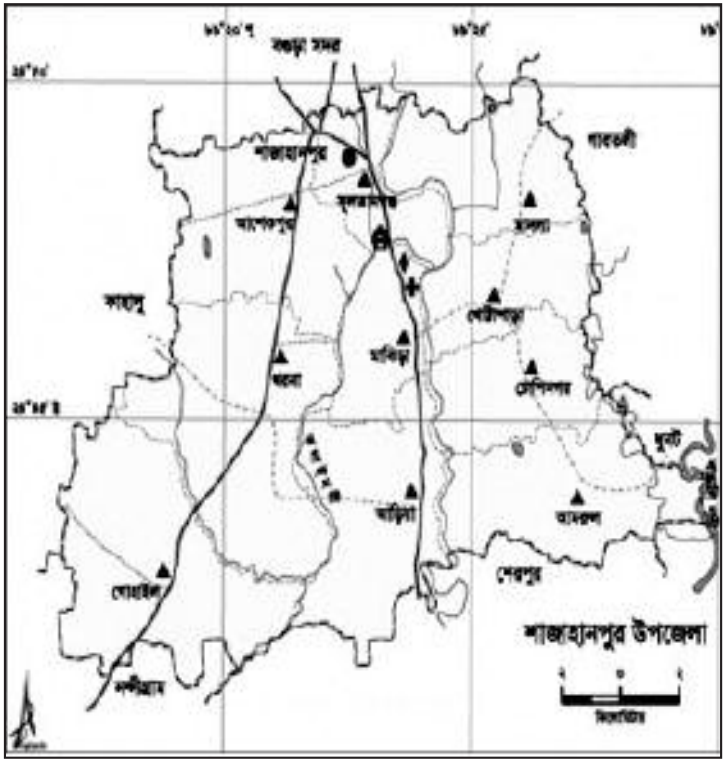

শাজাহানপুর উপজেলার মানচিত্র সৌজন্যে : *বাংলাপিডিয়া*

সীমানা : শাজাহানপুর উপজেলার উত্তরে বগুড়া সদর উপজেলা, দক্ষিণে শেরপুর উপজেলা, পূর্বে গাবতলী ও ধুনট উপজেলা, পশ্চিমে নন্দীগ্রাম ও কাহালু উপজেলা অবস্থিত ।

নদী : শাজাহানপুর উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– করতোয়া, চামতি, বাঙালি, ভদাই নদী। এছাড়া রয়েছে ডাকাতিয়া, লটকী, হাতীগাড়া, বড়দীঘি, ছোটদীঘি, জয়ঁচাদ দীঘি, পদ্ম পুকুর ও রানী পুকুর পোড়াদহ খাল।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : শাজাহানপুর উপজেলা মোট ১০টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। শাজাহানপুর উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– আড়িয়া, আমরুল, আশেকপুর, খোট্টাপাড়া, খরনা, গোহাইল, চোপিনগর, মাঝিড়া, মাদলা, সুলতানগঞ্জ। উপজেলায় ১৩১টি মৌজা এবং ১৩১টি গ্রাম রয়েছে।[৫৯]

শেরপুর উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

শেরপুর থানা গঠিত হয় ১৯৬২ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। শেরপুর উপজেলা জনসংখ্যার দিক থেকে চতুর্থ এবং আয়তনের দিক থেকে তৃতীয়।

আয়তন ও অবস্থান : শেরপুর উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ২৮৬৩০৮ এবং আয়তন ২৯৬.২৭ বর্গ কিলোমিটার। শেরপুর উপজেলার বর্তমান অবস্থান ২৪°৩২´ থেকে ২৪°৪৪´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২০´ থেকে ৮৯°৩২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা : শেরপুর উপজেলার উত্তরে শাহজাহানপুর উপজেলা, দক্ষিণে রায়গঞ্জ ও তাড়াস উপজেলা, পূর্বে ধুনট উপজেলা, পশ্চিমে নন্দীগ্রাম ও সিংড়া উপজেলা অবস্থিত ।

নদী : শেরপুর উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– করতোয়া, হলহলিয়া ও ভাদর নদী।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : শেরপুর উপজেলা মোট ৯টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। শেরপুর উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হল– কুসুম্বী, খানপুর, খামারকান্দি, গাড়ীদহ, বিশালপুর, ভবানীপুর, মির্জাপুর, সীমাবাড়ী, সুঘাট। উপজেলায় ২২৪টি মৌজা এবং ৩১৯টি গ্রাম রয়েছে।[৬০]

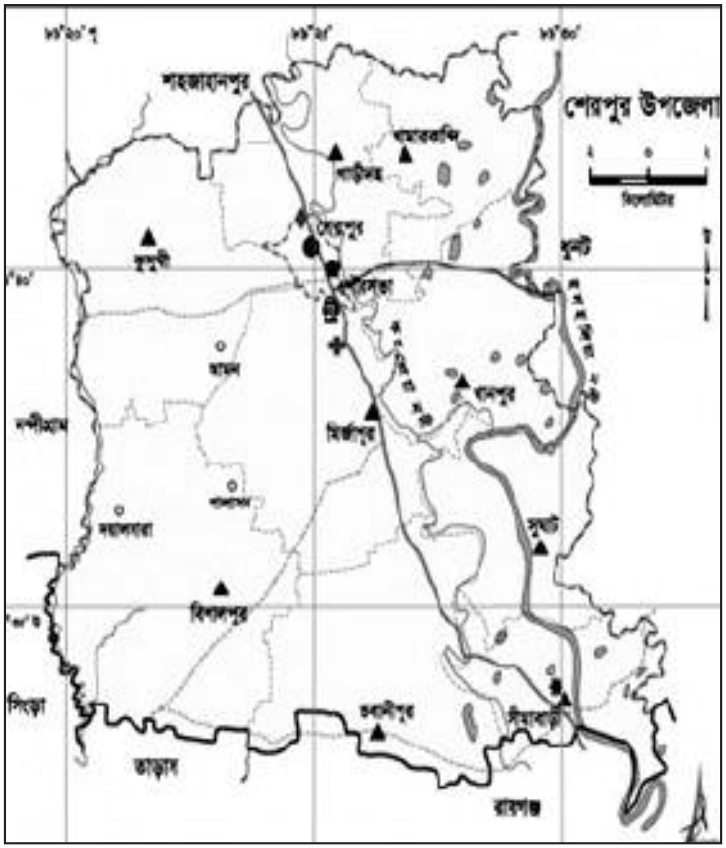

শেরপুর উপজেলার মানচিত্র সৌজন্যে : *বাংলাপিডিয়া*

শিবগঞ্জ উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

শিবগঞ্জ উপজেলা গঠিত হয় ২৪ মার্চ ১৯৮৩ সালে। শিবগঞ্জ উপজেলা জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয়।

আয়তন ও অবস্থান : শিবগঞ্জ উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ৩৫২৪১৫ এবং আয়তন ৩১৫.৯২ বর্গ কিলোমিটার। শিবগঞ্জ উপজেলার বর্তমান অবস্থান ২৪°৫৫´থেকে ২৫°০৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°১১´ থেকে ৮৯°২৮´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা : শিবগঞ্জ উপজেলার উত্তরে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা (গাইবান্ধা), দক্ষিণে বগুড়া সদর, কাহালু ও দুপচাঁচিয়া উপজেলা, পূর্বে সোনাতলা ও গাবতলী উপজেলা, পশ্চিমে কালাই ও তেলাল উপজেলা অবস্থিত ।

শিবগঞ্জ উপজেলার মানচিত্র সৌজন্যে : *বাংলাপিডিয়া*

নদী : শিবগঞ্জ উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– করতোয়া, নাগর, গানী, গজারিয়া, নুনগালার, ভিমতি নদী। এছাড়াও রয়েছে শব্দল দিঘি, দীঘার বিল, ভাটিমর্চ বিল ।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : শিবগঞ্জ উপজেলা মোট ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। শিবগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– আটমূল, কিচক, দেউলি, পিরব, বিহার, বুড়িগঞ্জ, ময়দানহাটা,

মাঝিহট্ট, মোকামতলা, রায়নগর, শিবগঞ্জ, সৈয়দপুর। উপজেলায় ২৪৫টি মৌজা এবং ৪২৯টি গ্রাম রয়েছে।[৬১]

আদমদীঘি উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

আদমদীঘি থানা গঠিত হয় ১৮২১ সালে। থানা উপজেলায় রূপান্তরিত হয় ১৯৮৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। আদমদীঘি উপজেলা জনসংখ্যার দিক থেকে নবম এবং আয়তনের দিক থেকে দশম।

আয়তন ও অবস্থান : আদমদীঘি উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ১৮৭০১২ এবং আয়তন ১৬৮.৮৪ বর্গ কিলোমিটার। আদমদীঘি উপজেলার বর্তমান অবস্থান ২৪°৪৩′ থেকে ২৪°৫২′ উত্তর

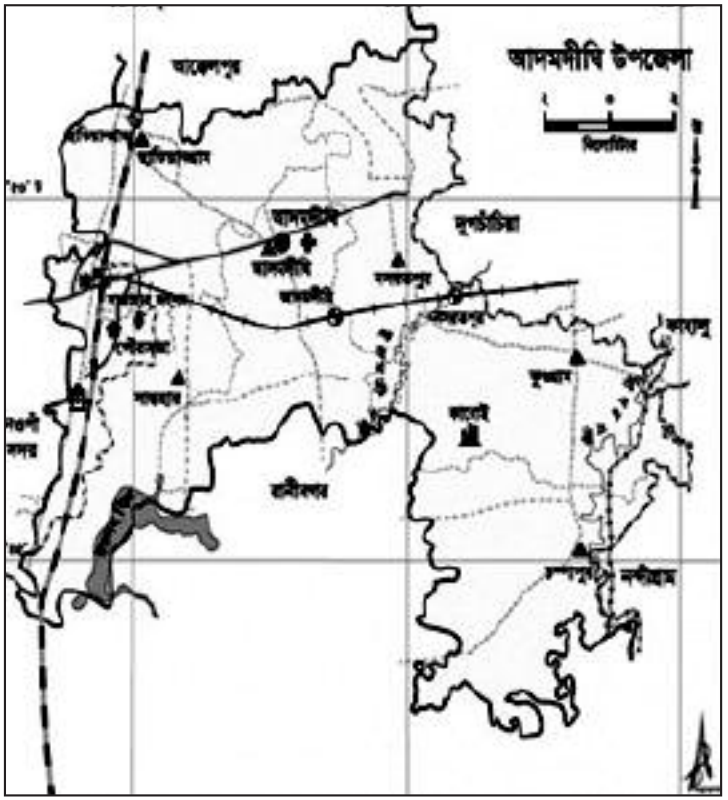

আদমদীঘি উপজেলার মানচিত্র সৌজন্যে : *বাংলাপিডিয়া*

অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫৮´ থেকে ৮৯°১০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা : আদমদীঘি উপজেলার উত্তরে আক্কেলপুর ও দুপচাঁচিয়া উপজেলা, দক্ষিণে রানীনগর উপজেলা, পূর্বে কাহালু ও নন্দীগ্রাম উপজেলা, পশ্চিমে নওগাঁ সদর উপজেলা অবস্থিত।

নদী : আদমদীঘি উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– নাগর ও ইরামতী নদী এবং রক্তদহ বিল উল্লেখযোগ্য।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : আদমদীঘি উপজেলা মোট ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। আদমদীঘি উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হল– আদমদীঘি, কুন্ডগ্রাম, চম্পাপুর, ছাতিয়ানগ্রাম, নসরতপুর, সান্তাহার। উপজেলায় ১১২টি মৌজা এবং ১৭৪টি গ্রাম রয়েছে।[৬২]

সারিয়াকান্দি উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

সারিয়াকান্দি থানা গঠিত হয় ১৮৮৬ সালে এবং পৌরসভায় রূপান্তর করা হয় ১৯৯৯ সালে। সারিয়াকান্দি উপজেলা জনসংখ্যার দিক থেকে ষষ্ঠ এবং আয়তনের দিক থেকে প্রথম।

আয়তন ও অবস্থান : সারিয়াকান্দি উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ২৪০০৮৩ এবং আয়তন ৪০৮.৪৫ বর্গ কিলোমিটার। সারিয়াকান্দি উপজেলার বর্তমান অবস্থান ২৪°৪৪´ থেকে ২৪°০৪´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩১´ থেকে ৮৯°৪৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা : সারিয়াকান্দি উপজেলার উত্তরে সাঘাটা ও সোনাতলা উপজেলা, দক্ষিণে ধুনট ও কাজীপুর উপজেলা, পূর্বে ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ ও সরিষাবাড়ী উপজেলা, পশ্চিমে গাবতলী উপজেলা অবস্থিত।

নদী : সারিয়াকান্দি উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– যমুনা, বাঙালি নদী।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : সারিয়াকান্দি উপজেলা মোট ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। সারিয়াকান্দি উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– কর্ণিবাড়ী, কাজলা, কামালপুর, কুতুবপুর, চন্দনবাইশা, চালুয়াবাড়ী, নারচী, ফুলবাড়ী, বোহাইল, ভেলাবাড়ী, সারিয়াকান্দি, হাটশেরপুর।

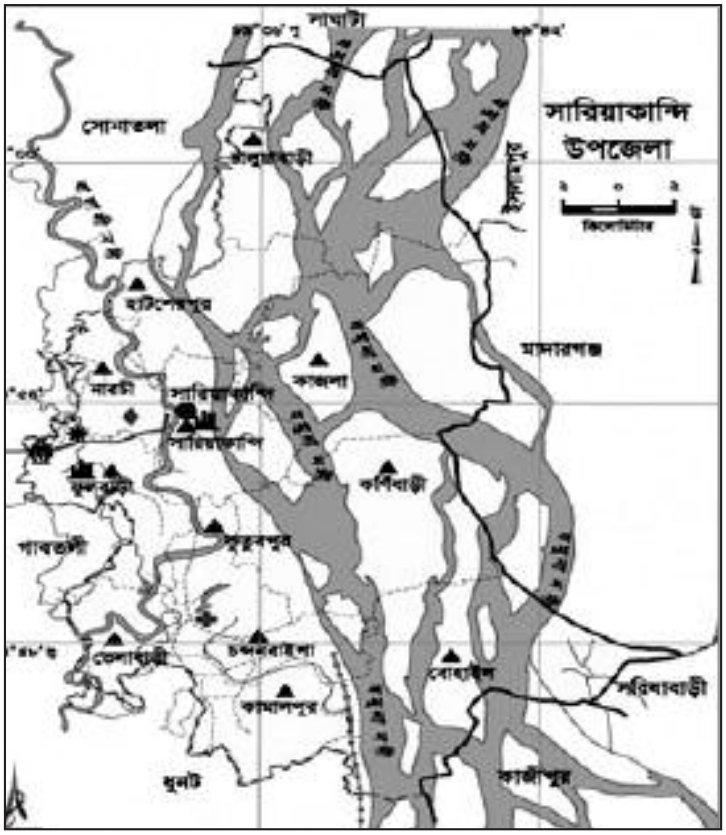

সারিয়াকান্দিউপজেলার মানচিত্র সৌজন্যে: *বাংলাপিডিয়া*

উপজেলায় ১২০টি মৌজা এবং ১৪৬টি গ্রাম রয়েছে।[৬৩]

সোনাতলা উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ

সোনাতলা থানা গঠিত হয় ১৯৮১ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। সোনাতলা উপজেলা জনসংখ্যার দিক থেকে এগারতম এবং আয়তনের দিক থেকে দশম।

আয়তন ও অবস্থান : সোনাতলা উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ১৬৭৫৪৭ এবং আয়তন ১৫৬.৭৩ বর্গ কিলোমিটার। সোনাতলা

উপজেলার বর্তমান অবস্থান ২৪°৫৫´ থেকে ২৫°০৪´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২৬´ থেকে ৮৯°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা : সোনাতলা উপজেলার উত্তরে সাঘাটা ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে গাবতলী ও সরিয়াকান্দি উপজেলা, পূর্বে সারিয়াকান্দি উপজেলা, পশ্চিমে শিবগঞ্জ (বগুড়া) ও গাবতলী উপজেলা অবস্থিত ।

সোনাতলা উপজেলার মানচিত্র সৌজন্যে : *বাংলাপিডিয়া*

নদী : সোনাতলা উপজেলার প্রধান প্রধান জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে– যমুনা, বাঙ্গালী, ভিমতি, লোহাগড়া নদী। এছাড়াও রয়েছে মোহিচরণ বিল, গোবরচাঁপা বিল ও নেয়াগন বিল।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড : সোনাতলা উপজেলা মোট ৭টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। সোনাতলা উপজেলার ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– জোড়গাছা, তেকানী চুকাইনগর, দিগদাইড়, পাকুল্লা, বালুয়া, মধুপুর, সোনাতলা। উপজেলায় ১০৩টি মৌজা এবং ১৩১টি গ্রাম রয়েছে।[৬৪]

বগুড়ার জেলার ১২টি উপজেলায় গণহত্যা ও গণহত্যার নিদর্শন বধ্যভূমি, গণকবর, শহিদের কবর ও নির্যাতন কেন্দ্রসমূহ আছে তা এই জরিপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

গণহত্যা

বগুড়াতে গণহত্যার সূচনা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ব্যাপক গণহত্যার সূচনা হয়। এরপর সারাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। বগুড়ার সাধারণ জনগণ ২৬ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরোধ করেছিল। কিন্তু এই কয়েক দিন পাকিস্তানি বাহিনি বারংবার বগুড়ার ওপর কর্তৃত্ব আনার চেষ্টা করে। ভারী অস্ত্র নিয়ে ১ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনি বগুড়ার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ২৬ মার্চ বগুড়ার নওদাপাড়ায় পাকিস্তানি বাহিনি প্রথম সাধারণ জনতার উপর গুলি চালায়। ঐ দিনই শহিদ হন তোতা মিয়া। তিনি বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহিদ। তোতা মিয়াকে গুলি করে ক্ষান্ত হয় নি পাকিস্তানি বাহিনি, তার মৃত দেহের ওপর দিয়ে জিপের বহর নিয়ে যায়। পাকিস্তানি বাহিনি এরপর তাদের বর্বরতার চূড়ান্তরূপ প্রদর্শন শুরু করে। ১ এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির হাতে শহিদ হন– টিটু, হিটলু, আজাদ, তারেক, সাইফুল, খোকন, মোফাজ্জল, মাসুদসহ অনেক সাধারণ মানুষ। বগুড়া শহর দখলের পর এপ্রিলের শেষ ভাগে তারা উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো জেলার উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসে।

বগুড়া সদর উপজেলার পর পরই পাকিস্তানি বাহিনি ৪ এপ্রিল প্রথম শিবগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করে এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭১ সনের ৭ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্য সকাল ৯টার দিকে বথুয়াবাড়ী বাঙালি নদী নৌকা যোগে পার হয়ে প্রথমে ধুনট থানায় আসে। একই দিনে পাকিস্তানি বাহিনির একটি দল নন্দীগ্রাম উপজেলায় প্রবেশ করে। এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ সন্ধ্যায় পাকিস্তানি সৈন্য সান্তাহার থেকে দুপচাঁচিয়ায় প্রথম প্রবেশ করে। ১৯ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যের একটি

দল রেলপথে আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার জংশন শহরে প্রবেশ করে এবং সেখানে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে।[৬৫] পাকিস্তানি সৈন্য গাবতলীতে ক্যাম্প স্থাপন করে ২৭ এপ্রিল। বগুড়ার সারিয়াকান্দি থানায় সর্বশেষ ২৯ এপ্রিল প্রবেশ করে এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসে। কিন্তু বগুড়ার মানুষ বিনা বাঁধায় তা করতে দেয় নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করেছে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধারা জলেশ্বরীতলায় অবস্থিত 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান'-এ হামলা করে প্রায় চার কোটি টাকা লুট করে এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য উক্ত টাকা তৎকালীন মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের হাতে অর্পণ করেন।[৬৬] প্রতিরোধের চেষ্টা ব্যর্থ হয় পাকিস্তানি বাহিনির ভারী অস্ত্রের কাছে। এর ফলে পাকিস্তানি বাহিনি পুরো জেলার ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

পাকিস্তান বাহিনি পুরো জেলার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পর জেলা জুড়ে শুরু করে ব্যাপক গণহত্যার। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানি বাহিনির দ্বারা বগুড়া জেলায় ব্যাপক গণহত্যা সংঘটিত হয়। বগুড়া জেলার ১২টি উপজেলায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনি এদেশীয় দোসর রাজাকার আলবদরদের সহযোগিতায় নির্বিচারে নিরীহ সাধারণ মানুষদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। হত্যা করে তাদের গণকবর দেওয়া হয়েছে। বগুড়া জেলায় এরকম বেশ কিছু বধ্যভূমি ও গণকবর রয়েছে। এসব বধ্যভূমি ও গণকবরের জায়গায় কিছু স্মৃতিচিহ্ন থাকলেও বেশির ভাগ গণকবর ও বধ্যভূমির কোন চিহ্ন নেই। বেশির ভাগ মানুষ জানেন না এইসব জায়গায় গণকবর ও বধ্যভূমি ছিল। পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও বিহারি সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় জেলার যে সব স্থানে নিরীহ বাঙালি গণহত্যার শিকার হয়েছে এবং তাদের গণহত্যার নিদর্শন গণকবর, বধ্যভূমি, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর ও নির্যাতন কেন্দ্র রয়েছে তার পরিচয় সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে এই জরিপে। মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক, প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিচারণমূলক লেখা ও সাক্ষাৎকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়ক গ্রন্থ দলিলপত্র ভিত্তিতে এ জরিপ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে।

বগুড়া সদর উপজেলা

বড়গোলা গণহত্যা

মার্চের শুরুতে পাকিস্তানি সেনারা বগুড়া দখলের প্রচেষ্টারত অবস্থায় রেললাইনের দু'নম্বর ঘুমটির কাছে আসলে আজাদ রেস্ট হাউজের ছাদ থেকে দারোগা নিজামউদ্দীন, দারোগা নুরুল ইসলাম এবং তাদের সহযোগীদের ৩০৩ রাইফেল গর্জে ওঠে। সম্মুখ দিক এবং দু'পাশ থেকে আক্রান্ত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা থমকে দাঁড়ায় এবং কিছুটা পিছু হটে যায়। এমন সময়ে বড়গোলার ইউনাইটেড ব্যাংকের ছাদের ওপর থেকে তিনটি বন্দুক গর্জে ওঠে। অতি উৎসাহে নেতৃত্বের অজান্তে ব্যাংকের ছাদে পজিশন নিয়েছিলেন– টিটু, হিটলু এবং মুস্তাফিজ (ছনু)। দু'জন পাকিস্তানি সেনা জখম হয়। পিছন থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে হানাদার সেনাদল বিচলিত হয়ে পড়ে। পিছু হটে দ্রুত পাকিস্তানি সৈন্যরা ব্যাংক ভবনটি ঘিরে ফেলে। টিটু, হিটলু এবং ছনু সরে যাবার সুযোগ পেল না। শহিদ হলো বগুড়ার তিনটি দামাল ছেলে। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ বর্বর হানাদার সেনারা দ্রুত পিছু হটে শহর ছেড়ে গেলো। ডাকবাংলো এবং মহিলা কলেজে অবস্থান নিয়ে তারা বগুড়া পৌরসভা এলাকায় ৯ মাসব্যাপী নির্মম গণহত্যা চালায়।[৬৭]

বগুড়া সদর গণহত্যা

'৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনি এবং তাদের এদেশীয় দোসররা বগুড়া সদরে কয়েকটি স্থানে ক্যাম্প করে আশপাশের গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, ধর্ষণ ও নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। টি এম মুসা বলেন, ফুলবাড়ি, জামিলের গোডাউন, মদলা জেলা স্কুল ও সার্কিট হাউসসহ সদরের আরও দু'তিনটা জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনি বাঙালিদের ধরে

নিয়ে হত্যা করে। তবে লাশগুলো সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। এসব এলাকায় গণহত্যায় নিহত ২৬৭ জনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা সবাই বগুড়ার স্থানীয় ও নিরীহ জনগণ। যাদের পাকিস্তানি সৈন্যরা বগুড়ার বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে এনেছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া সাধারণ জনগণই বেশি ছিল। এ এলাকায় নারী নির্যাতনও হয় ব্যাপকভাবে। নির্যাতিত নারীদের মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছিল। এঁদের মধ্যে দুজন পরবর্তীকালে পাগল হয়ে যায়। যাঁরা আর সুস্থ হয়নি।[৬৮]

গোকুল রামশহরের পীরবাড়ি গণহত্যা

বগুড়া শহর থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার উত্তরে গোকুল ইউনিয়নে রামশহর গ্রামটি অবস্থিত। ১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর পাকিস্তানি বাহিনির গণহত্যার শিকার হয় রামশহরের পীর পরিবারের ৭ জনসহ মোট ১১ জন মানুষ। বিজয়ের মাস আর স্বাধীনতার মাস এলেই পীর পরিবারটিকে মুক্তিযোদ্ধা পরিবার হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ অন্য সময় পরিবারটিকে জামায়াত বা রাজাকার বানানোর চেষ্টা চলে জোরেসোরে। মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশের অধিকাংশ পীর পরিবারের সদস্যরা যখন পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর বা সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করেছে, সেসময় বগুড়ার এই পীর পরিবারটি সক্রিয় ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করেছে। আর এই জন্য ঐ পরিবারের সদস্যদের পাকিস্তানি বাহিনী গুলি করে হত্যা করে।

বগুড়ার গোকুল ইউনিয়নের রামশহর পীর বাড়িতে সংঘটিত গণহত্যায়। সেদিন পাকিস্তানি বাহিনির হাতে শহিদ হন– রামশহরের তবিবুর রহমানের দুই সহোদর পীরজাদা বেলায়েত হোসেন, দবির উদ্দীন ও হাবিবুর রহমান। এছাড়াও তবিবুর রহমানের ভাতিজা আব্দুস সালাম লালু, খলিলুর রহমান ও জাহিদুর রহমান মুকুল এবং তার ফুফাতো ভাই আসগর আলী। পীর পরিবারের ওপর গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি একই গ্রামের মজিবুর রহমান, হায়দার

আলী, বুলু মিয়া এবং একই গ্রামের জামাতা মোকসেদ আলীকে তুলে নিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলে।

সেদিন হামলার সময় পালিয়ে বেঁচে যান পীর সাহেবের ছোট ভাই আলহাজ্ব মো. তবিবুর রহমান।[৬৯] শহিদ পীর পরিবারের সন্তান তাদের পরিবারের ওপর আক্রমণের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানান, 'সেদিন ছিল ২৩ রমজানের রাত্রি। পীর পরিবারের সদস্যরা সবেমাত্র যে যার ঘরে সেহেরী খাওয়ার জন্য বসেছেন; এমন সময় বাড়িতে হানা দেয় পাকিস্তানি সেনারা। তাদের সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন রাজাকার। তারা বাড়িতে ঢুকেই পীর বাড়িতে থাকা দু'টি বন্দুকের খোঁজ শুরু করেন। হানাদাররা বাড়িতে ঢুকেছে এই খবর পেয়ে খাবার ছেড়ে প্রাচীর টপকে পালানোর চেষ্টা করেন পীর সাহেবের ছোট ভাই মো. তবিবুর রহমান। তাকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি ছোঁড়ে হানাদাররা। কিন্তু তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। সেই গুলির শব্দে ভীত সন্তস্ত্র হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। হানাদাররা ওই বাড়িসহ প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে গিয়ে পুরুষ সদস্যদের পিছমোড়া করে বেঁধে এনে উঠানে সারিবদ্ধ করে বসায়। এসময় পীর সাহেব (শহিদ বেলায়েত হোসেন) তাদের ধরে আনার কারণ জানতে চাইলে তাকে বলা হয়, বাড়ির মুক্তিযোদ্ধা সদস্যরা কোথায়? তাদের তথ্য না পেয়ে ওই বাড়িতে থাকা বন্দুক ও গুলি বের করে দিতে বলে। ঘরের একটি বাক্স খুলে বন্দুকের গুলি বের করার সময় তার ছেলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মুকুল একটি বন্দুক এনে তার মায়ের পিছনে দাঁড়ায়। এটি দেখে এক পাকিস্তানি সেনা তার হাত থেকে সেই বন্দুক নিয়ে তাকেও বসিয়ে রাখে অন্য সদস্যদের সঙ্গে। ইতিমধ্যেই ফজরের আযান পড়ে। পীর সাহেব নামাজ পড়ার জন্য বাইরের মসজিদে যেতে চাইলেও তাকে বের হতে দেয়নি হানাদাররা। সবগুলো ঘরে ঢুকে একে একে বাক্স আলমারি ভেঙে তারা লুটতরাজ করে। এক পর্যায়ে সকলকে বাইরে নিয়ে আসা হয়। পীরবাড়ির পুকুর পাড়ে তাদের সারিবদ্ধ করে বসিয়ে রেখে

ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে হানাদাররা। পরে লাশগুলো সেখানে ফেলে রেখে চলে যায়।'[৭০]

গোকুল রামশহরের পীরবাড়ি গণহত্যার শিকার শহিদের নাম

বগুড়া পুলিশ লাইন গণহত্যা

বগুড়া পুলিশ লাইনে পাকিস্তানি বাহিনির একটি শক্তিশালী ক্যাম্প ছিল। পাকিস্তানি বাহিনি তাদের সহযোগীদের সহায়তায় বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন ধরে নিয়ে এসে গুলি করে হত্যা করতো। তবে এখানে আসলে কতজনকে হত্যা করা হয়েছিল তার সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া

যায় নি। বগুড়া পুলিশ লাইনের স্মৃতিস্তম্ভে '৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বগুড়ায় কর্মরত শহিদ পুলিশের ২১ জনের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। সেই শহিদরা হলেন– সামসুদ্দিন সরকার (সিআইবি), আ. কাদের (এএসআই), গুলজার হোসেন (কনস্টেবল), খোদা বক্স, চান মিয়া, আব্দুল করিম, ইসমাইল হোসেন, খোন্দকার আব্দুল আজিজ, হারুনার রশীদ, আনোয়ার সরকার, খায়রুল বাশার, ইউসুফ খান, আব্দুর রহিম, মোসলেম উদ্দীন, ইসহাক শরীফ, মশিউর রহমান, সমির উদ্দীন, মনির উদ্দীন আহমেদ, সুশীল মোহন বড়ুয়া, আব্দুল মান্নান, আব্দুল করিম, নাজিমুদ্দিন। পুলিশ লাইনের স্মৃতিস্তম্ভে যাদের নাম রাখা হয়েছে, তাদের সবাই পুলিশ লাইনে হত্যার শিকার হয়নি। কেউ কেউ কর্মরত অবস্থায় বগুড়ার অন্য জায়গায় শহিদ হয়েছেন।[৭১]

বগুড়া পুলিশ লাইন

চেলোপাড়া রেলক্রসিং গণহত্যা

বগুড়ার জেলা সদরের চেলোপাড়া রেলক্রসিং-এর কাছে তালগাছের গোড়ায় পাকিস্তানি সৈন্যরা এক সঙ্গে ১৫০ জন নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। পাকিস্তানি বাহিনি রাজাকারদের

সহযোগিতায় এ গণহত্যা সংঘটিত করে।[৭২]

চেলোপাড়া রেলক্রসিং

হাফিজার রহমানের বাড়ির গণহত্যা

কাটনারপাড়া ঠিকাদার হাফিজার রহমানের বাড়িতে একটি গণহত্যা সংঘটিত করে পাকিস্তানি বাহিনি। এ গণহত্যায় বগুড়া শহরের রাজাকাররা পাকিস্তানি বাহিনিকে সহযোগিতা করে। পাকিস্তানি বাহিনির হাতে শহিদ হওয়া নিরীহ মানুষজনকে স্থানীয় লোকেরা কবর দেয়।[৭৩]

শেরপুর রোড গণহত্যা

বগুড়া শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধারণ লোকজনকে পাকিস্তানি বাহিনি ধরে এনে শেরপুর রোডের পাশে বিভিন্ন জায়গায় হত্যা করতো। হানাদার কসাই ও জসিম উদ্দীনকে তাদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে শেরপুর রোডের পাশে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়।[৭৪] এছাড়া নয় মাসে অজস্র ব্যক্তিকে হত্যা করে। যাদের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

সরলপুর গণহত্যা

মহাস্থানগড় থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিমে গোকুল ইউনিয়নের সরলপুরে পাকিস্তানি বাহিনি অগ্রহায়ন মাসের দিকে অভিযান চালায়। এই অভিযানে তারা ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সরলপুর গণহত্যার সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। এই গণহত্যার দুই জন শহিদের নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন– হাফিজার রহমান ও বাবুল। তাদের উভয়ের বয়স ছিল ১৮ বছর।[৭৫]

শিববাটি গণহত্যা[৭৬]

১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল রাত আনুমানিক ৪টায় শিববাটি এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনি হামলা করে। তারা প্রথমেই লুটপাট করে বগুড়ার কনিষ্ঠতম মুক্তিযোদ্ধা ইব্রাহিমের বাড়িতে। মা-বোনসহ তিনি কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে যান। পরবর্তীকালে তারা আশ্রয় নেন গ্রামের বাড়ি ডাকুর চরে।[৭৭] শহরের শিববাটি এলাকার বাসিন্দারা ঘুমিয়ে ছিল। ঠিক তখন পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে রাজাকার আর হানাদার বাহিনির সদস্যরা। শিববাটি এলাকায় সাধারণ মানুষের বাড়ির দরজা ভেঙে ভেঙে ভিতরে ঢুকে। হানাদার বাহিনির একদল সশস্ত্র সদস্য হাফিজার ঠিকাদারের বাড়িতে ঢুকে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তাকে গুলি করে হত্যা করে। গুলির শব্দে ঘর থেকে বের হয়ে আসে স্ত্রী খোদেজা খাতুন, তার পুত্র প্রকৌশলী বদরুল করিম, ছোট ছেলে টুটুল, বদরুলের শ্বশুর সেকেন্দার আলী, তার স্ত্রী আনজুমান আরা ও গৃহপরিচারিকা একটি শিশু। পাকিস্তানি সেনারা তাদের ওপর গুলি চালায়। আনজুমান আর ছাড়া সবাই ঐ দিন মারা যায়। আহত আনজুমান আরা ৭ দিন পর মারা যায়। একই কবরে তাদের দাফন করা হয়েছে। আনজুমান আরাকেও ঐ স্থানে আলাদা জায়গায় কবর দেওয়া হয়। এ পরিবার থেকে বেঁচেছে হাফিজার ঠিকাদারের ৪ বছরের মেয়ে এবং পুত্র বদরুলের স্ত্রী ঐ দিন পাকিস্তানিদের হাত থেকে বেঁচে যায়।[৭৮]

বগুড়া শহর গণহত্যা

বগুড়া শহরে পাকিস্তানি বাহিনির নৃশংসতা নয় মাসব্যাপী চলে। এই গণহত্যায় তাদের স্থানীয় রাজাকার, আল-বদর, আল শামস ও অবাঙালিরা

সহায়তা করে। পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতা সম্পর্কে যুগোল কিশোর গোস্বামী বলেছেন, 'আমরা তিন ভাই তখন খেতে বসেছিলাম। হঠাৎ সেই মুহূর্তেই বাড়ির ভিতর ঢুকলো কয়েকজন অবাঙালি। ওরা আমার ভাইদের খেতে দেয়নি। এসেই ভাইদের হাত বেঁধে ফেললো। বৃদ্ধ বলেই বোধহয় আমাকে ওদের সঙ্গে নেয় নি। কিন্তু আমার ভাইয়েরা আর ফিরে আসেনি। একদিন এক খাঙড় এসে আমাকে জানালো, পাকিস্তানি সেনারা রাস্তার ধারের গর্তে আমার ভাইদের পুঁতে রেখেছে।'[৭৯]

বগুড়া রেলওয়ের একজন পদস্থ বাঙালি কর্মচারীর গণহত্যা সম্পর্কে বলেন– 'তখন জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ। রাতে শুয়ে আছি। হঠাৎ ইন্টার ক্লাশ ওয়েটিং রুম থেকে ভেসে এলো করুণ আর্তনাদ। আমাকে বাঁচাও বলে কে যেনো চিৎকার করছিল। একটু পরেই থেমে গেলো। বুঝলাম সে আর নেই।' তিনি আরও বলেন, ওরা সব করেছে। বাঙালিরা সবাই ছিল ওদের শত্রু। যে বাঙালিই রেলস্টেশনের আশেপাশে আসতো তাকেই তারা হত্যা করতো। একদিন কয়েকজন নিরীহ বাঙালিকে দিয়ে সৈন্যরা তাদের মালপত্র ট্রেনে উঠালো। তারপর কাজ শেষে শুরু হলো আমানুষিক অত্যাচার। সৈন্যরা তাদের ওয়াগানের পিছনে নিয়ে দু'পা সামনে করে পায়ের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে বসিয়ে রাখলো। তার পর কয়েকজন উঠলো তাদের পিঠের উপর জীবন্ত মানুষের হারগুলো এভাবে ভেঙ্গে দিলো। এর পর তাদের যথারীতি হত্যা করা হলো। পাকিস্তানি দস্যুরা এই রেল স্টেশনের আশেপাশে অহরহই মানুষদের এমনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতো।'[৮০] এভাবে বগুড়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় নয় মাসব্যাপী গণহত্যা সংঘটিত হয়।

ধুনট উপজেলা

ধুনট গণহত্যা

৪ নভেম্বর ধুনট সদরে একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি সেনাদের বুলেটের আঘাতে বগুড়ার ধুনট উপজেলার ২১ জন মুক্তিযোদ্ধা এক সঙ্গে শহিদ হয়। যারা শহিদ হন

ধুনট

তাদের কয়েকজনের নাম জানা যায়, তারা হলেন– ধুনট অফিসারপাড়ার জহির উদ্দিন, কান্তনগর গ্রামের নয়া মিয়া ও মোস্তাফিজার রহমান[৮১], চন্দারপাড়ার আব্দুল লতিফ, শিয়ালা গ্রামের পর্বত আলী, নূরুল ইসলাম[৮২] এবং একই পরিবারের সহোদর দুইভাই জিল্লুর রহমান ও ফরহাদ আলী। এছাড়া নাম না জানা আরো ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা সেদিন পাকিস্তানি সেনাদের হাতে শহিদ হয়েছেন।[৮৩] এই গণহত্যাটি কুঠিবাড়ি গণহত্যা হিসেবেও পরিচিত।[৮৪] ধুনট সদরের অফিসপাড়ায় স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের অযত্ন, অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শহিদের গণকবরটি আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলছে।

ধুনট থানা গণহত্যা

১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনি ধুনট থানায় আক্রমণ করে ১ জনকে গুলি করে হত্যা করে। ২৭ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনি পুনরায় উক্ত থানা আক্রমণ করে ৫ জন বাঙালি সিপাহীকে হত্যা করে। ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি বাহিনি ১৭ জন নিরীহ লোককে হত্যা করে থানার পাশে গণকবর দেয়।[৮৫] পাকিস্তানি বাহিনির হাতে যারা শহিদ হন, তাদের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

এলাঙ্গী হিন্দু পাড়া গণহত্যা

১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল সকাল ১১টার দিকে পাকিস্তানি বাহিনি তাদের সহযোগীদের ইঙ্গিতে ধুনটের এলাঙ্গী ইউনিয়নের হিন্দু পাড়ায়

আক্রমণ চালায়। শতশত ঘর-বাড়িতে আগুন দেয় এবং নির্বিচারে গুলি চালায়। পাকিস্তানি বাহিনির গুলিতে নিহত হয় ২৭ জন। এর মধ্যে দুই জনের নাম জানা যায়– মাধাইচন্দ্র ও হারান প্রামানিক।[৮৬] রাস্তা ও ফসলের ক্ষেতে পড়ে থাকে মৃতদেহগুলো। এলাকাবাসী পরে মৃত দেহগুলো মাটিচাপা দেয়।[৮৭]

এলাঙ্গী হিন্দু পাড়া

বরইতলি গ্রাম গণহত্যা

১৯৭১ সালের ৮ এপ্রিল বিকেলে আক্রমণ চালায় ধুনটের নিমগাছি ইউনিয়নের বরইতলি গ্রামে। এ আক্রমণের সময় পাকিস্তানি বাহিনি ৫ জনকে গুলি করে হত্যা করে। নিহতদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।[৮৮]

কালের পাড়া ইউনিয়ন গণহত্যা

৪ মে পাকিস্তানি বাহিনি ধুনট থানার কালের পাড়া ইউনিয়নে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের সময় পাকিস্তানি বাহিনি কালের পাড়া ইউনিয়নে লুটপাট করে এবং সাধারণ মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার করে। পাকিস্তানি বাহিনির এই আক্রমণে ৩ জন সাধারণ মানুষ শহিদ হন।[৮৯]

দুপচাঁচিয়া উপজেলা

দুপচাঁচিয়া থানা সদর গণহত্যা

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনিরা সান্তাহার থেকে দুপচাঁচিয়ায় প্রথম প্রবেশ করে। পরের দিন হাইস্কুলের নিকটে কাঠের সেতু সংলগ্ন এলাকায় কাপড় ব্যবসায়ী সতীশ চন্দ্র বসাকের দোকানে হামলা করে তাকে মেরে ফেলে। এরপর থানা সদরের অবাঙালিদের সহযোগিতায় থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডা. আনোয়ার হোসেনের ওষুধের দোকান ও বাড়ি-ঘরে গান পাউডার দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। ওই রাতেই থানা সদরের কয়েকটি হিন্দুর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাদের এই আক্রমণে নয় থেকে দশজন হিন্দু নিহত হয়।[৯০]

দুপচাঁচিয়া থানা সদরের পাশে কাঠের সেতু

গাবতলী উপজেলা

সুখান পুকুর গণহত্যা

পাকিস্তানি বাহিনি গাবতলী থানার সুখান পুকুরের একাধিক বার হামলা চালিয়ে গ্রামের সমস্ত ঘর পুড়িয়ে দেয়। সুখান পুকুরের একটি গ্রাম ঘিরে পাকিস্তানি বাহিনি সেখানকার ১১০ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে।[৯১] অন্য এক দিন আক্রমন চালিয়ে ২৮ জন লোককে গুলি

করে হত্যা করে। সুবেদার মেজর হানিফের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনি সুখান পুকুরে এ নারকীয় তান্ডব চালায়।[৯২] এছাড়া তারা কামুইল, ঘোনা, মালদা প্রভৃতি গ্রামের বহু লোককে হত্যা করে।[৯৩]

সুখান পুকুর

লাংলুহাট গণহত্যা

গাবতলী উপজেলার লাংলুহাটে পাকিস্তানি বাহিনি একটি গণহত্যা সংঘটিত করে। শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলা ডাকবাংলো ক্যাম্প থেকে পাকিস্তানি বাহিনির একটি দল শঙ্করপুর গ্রামে আক্রমণ করে। আক্রমণ শেষে ৭ কিলোমিটার পূর্ব দিকে মোকাতলা সোনাতলা রোড়ের লাংলুহাটে আক্রমণ করেন। পাকিস্তানি বাহিনির সাথে মোকামতলা এলাকার কয়েকজন রাজাকার ছিল। এই আক্রমণে লাংলু দক্ষিণপাড়া ইউনিয়নের শিমুলটার গ্রামের আহমদ উল্লাহ পাকিস্তানি বাহিনির হাতে শহিদ হন। উল্লেখ পাকিস্তানি বাহিনির সাথে যে রাজাকারা যায় শহিদ আহমদ উল্লার একদম নিকট আত্মীয় তাদের মধ্যে ছিল বলে জানা যায়।[৯৪] আর কতজন শহিদ হয়েছিলেন তার সংখ্যা ও নাম জানা সম্ভব হয় নি।

শৌলকান্দি গণহত্যা

বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ হয়। ৭১-এর মাঝামাঝিতে কাগইল ইউনিয়নের শৌলকান্দির বেশ কয়েকজন মানুষ নিখোঁজ হয়। তারা আর ফিরে আসে নি, পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা গণহত্যার শিকার হয়েছে। যারা ফিরে আসে নি তাদের মধ্যে সাইকেলের মেকার আফজাল হোসেন একজন। অন্যদের নাম জানা যায় নি।[৯৫]

কাহালু উপজেলা

কাহালু রেলষ্টেশন বা বাবুর বাড়ী গণহত্যা

সান্তাহার হতে রেলযোগে বগুড়া যাওয়ার মুখে ৫ মে ১৯৭১ কাহালু রেলষ্টশনে কতিপয় বিহারির ইন্ধনে কাহালু জমিদার বাড়ী (বাবুর বাড়ী) হানা দিয়ে চির কুমার জমিদার ও সেবায়েত গোবিন্দ জিউ বিগ্রহ দেবততের সেবায়ীত কালিপদ মজুমদার সহ কাহালু পালপাড়া ও লক্ষীপুর গ্রামের প্রায় ২১ জন হিন্দু ও মুসলিমকে ধরে নিয়ে যায়। এর মধ্যে– পালপাড়া গ্রামের ভূপিন্দ্রনাথ মহন্ত, কুড়ানু চন্দ্র, কালা চন্দ্র,

কাহালু রেলষ্টেশন বা বাবুর বাড়ী বর্তমানে সংস্কৃত কলেজ

অভয় চন্দ্র, রাধান্দ্রনাথ, কৃষ্ণ গোপাল মহন্ত, গৌর গোপাল মহন্ত হিন্দু ব্যক্তি ও লক্ষীপুর গ্রামের শুকরা, ভুলু কসাই, মাহমুদ আলী, আমির আলী (আমু) বন্দি করে তাদের রেলষ্টেশনে নিয়ে আসে এবং বগুড়াতে

মেজরের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে, উপজেলার উলট্ট নামক স্থানে চলান্ত ট্রেন হতে উক্ত ব্যক্তিদের পিছেন হতে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়।[৯৬] স্থানীয় জনগণ লাশগুলি নিকটস্থ জমিদারের এক খন্ড জমিতে গণকবর দেন।

গিরাইল গ্রাম গণহত্যা

কাহালু রেলষ্টেশন গণহত্যার ২ দিন পর পাকিস্তানি বাহিনি ও বিহারিরা থানার গিরাইল গ্রামে ১৩ জন হিন্দু– পেমা চন্দ্র, নারায়ণ চন্দ্র, ঝটু চন্দ্র, রুহিনাথ চন্দ্র, চান্দ চন্দ্র, রামাকান্ত চন্দ্র, ফতু চন্দ্র, তিলক চাঁন, কর্ণধর ও তারা চন্দ্রকে হত্যা করে।[৯৭] গিরাইল গ্রাম হত্যার পর পাকিস্তানি বাহিনি নশিরপাড়ায় গিয়ে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এরপর বিবিরপুরের দিকে গিয়ে সেখানেও গণহত্যা চালায়।

গিরাইল গ্রাম

নশিরপাড়া গণহত্যা

কাহালুর গিরাইল গ্রামে গণহত্যার পর পাকিস্তানি বাহিনি নশিরপাড়া গ্রামের অশোক প্রাং[৯৮]; রজিব উদ্দীন সরদার, পিতা : হামিদ সরদার; নূর উদ্দীন কাজী, পিতা : নবায়ু কাজী; মিনাকা, পিতা : জসীম উদ্দীন প্রামানিক; রইচ উদ্দীন কাজী, পিতা : আছিম উদ্দীন কাজী; আব্দুস সামাদ, পিতা : আব্দুস রমজান প্রামাণিক; রমজান আলী

প্রামাণিক; ছলিম উদ্দীন প্রামাণিক, পিতা : বহরউল্লাহ প্রামাণিক, গোলাম উদ্দীন, পিতা : নাবুল্লা শেখ, মফিজউদ্দীন কাজী, পিতা : ফাজিল কাজী[৯৯]; রশিদ আলী ও খোরশেদ আলী, শেখপাড়া;[১০০] খোসা প্রাং, গোলাম উদ্দিন প্রাং, ছলিমুদ্দি, ও লেবুকে হত্যা করে।[১০১] এই গ্রামে কোনো স্মৃতিসৌধ নির্মাণ হয়নি। শহিদের কবরও সংরক্ষণ করা হয়নি। সেদিন যারা শহিদ হয়েছিল তাদের লাশ পারিবারিক তিনটি কবর স্থানে দাফন করা হয়েছে।[১০২]

জয়তুল গ্রাম গণহত্যা

পাকিস্তানি বাহিনি রাজাকারদের সহায়তায় কাহালু উপজেলার জয়তুল গ্রামে আক্রমণ করে। পাকিস্তানি বাহিনির আক্রমণে যারা শহিদ হন তারা হলো– মোহাম্মদ আলী, আকবর আলী, আব্দুল খালেক, লছির প্রাং, আব্দুস সামাদ প্রাং, আব্দুল জোব্বার প্রাং, আব্দুল মালেক প্রাং, আফসার আলী প্রাং, সেদু শাহ্, দছির শাহ্, ধলু প্রাং, রমজান আলী প্রাং, লবিস শাহ্, ছহির উদ্দিন, মহির উদ্দিন, হেতা প্রাং, হাতিম প্রাং, হযরত শেখ, বছির উদ্দিন শেখ, মকবুল শেখ, আব্দুল মালেক শেখ, লিতো, দছিমউদ্দিন শাহা সহ প্রায় ৭০ জন।[১০৩]

জয়তুল গ্রাম গণহত্য

গিরাইল, লক্ষ্মীপুর, মুরইল, ডোমরগ্রাম ও কাহালু সদর এলাকার অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করা ছাড়াও পাকিস্তানি বাহিনি মানুষের বাড়ি ঘর আগুন দিয়ে পুড়ে দিয়েছে।[১০৪]

নন্দীগ্রাম উপজেলা

বামন গ্রাম গণহত্যা

১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল (রবিবার) রাত সাড়ে ১২টার দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি দুটি জিপ গাড়ি নিয়ে নন্দীগ্রাম সদর ইউনিয়নের সিমলা গ্রামের মধ্যে দিয়ে ভাটরা ইউনিয়নের বামন গ্রামে যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথিমধ্যে ভাগসিমলা রাস্তায় কাঁদাপানি থাকার কারণে জিপগাড়ি রেখে পাকিস্তানি সেনারা পায়ে হেঁটে রওনা দেয়। এরপর বামন গ্রামে হিন্দুপাড়ায় আক্রমণ চালিয়ে দুখ পুকুর পাড়ের পশ্চিম পাশে সারিবদ্ধ করে প্রানবন্ধু চন্দ্র কবিরাজ, মনিন্দ্র চন্দ্র সাহা, প্রানকান্ত চন্দ্র প্রামানিক, পূর্ণ চন্দ্র সাহা, সুখি রবিদাস, রামদেব রবিদাস, বলরাম চন্দ্র প্রামানিক, রমানাথ সরকার ও রবি চন্দ্র প্রামানিককে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।[১০৫]

বামন গ্রাম গণহত্যার ফলক

হাটকড়ই হিন্দুপাড়া গণহত্যা

৫ এপ্রিল রাত সাড়ে ৩টার দিকে হাটকড়ই হিন্দুপাড়ায় পাকিস্তানি সৈন্যরা হানা দেয় রাজাকারদের সহায়তায়। এই অভিযানে তারা আটক করে– সুরেশ চন্দ্র, বুজেশ্বর চন্দ্র, সুরেস চন্দ্র প্রামানিক ও অধির চন্দ্রকে। পরে তাদেরকে হাটকড়ই হাইস্কুল মাঠে জড়ো করে হত্যা

করে। স্কুল মাঠে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের লাশ ফেলে রেখে যায়। এলাকাবাসী পরে তাদেরকে শ্মশানে সমাধি করা হয়।[১০৬]

নন্দীগ্রাম গণহত্যা

৯ ডিসেম্বর নন্দীগ্রামের বেলঘরিয়ায় পাকিস্তানি সেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়।[১০৭] এ যুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসররা ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। এই রকম কয়েক জনের নাম পাওয়া যায়। তারা হলো– চাকলমা গ্রামের আকরাম হোসেন, বাদলাশন গ্রামের আব্দুল ওহেদ, রুস্তমপুর গ্রামের মহিউদ্দিন (মরু মন্ডল), ভাটরা গ্রামের আব্দুর সোবাহান, নন্দীগ্রামের মোফাজ্জল হোসেন, হাটকড়ই গ্রামের ছমিরউদ্দিন ও তার দুই পুত্র আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুর রশিদ।[১০৮]

শাজাহানপুর উপজেলা

মাদলা গ্রামে গণহত্যা

৯ নভেম্বর ১৯৭১ সালে স্থানীয় রাজাকারদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সৈন্যরা শাজাহানপুরের মাঝিড়ার মাদলা চাঁচাইতারা হিন্দুপাড়া ঘেরাও করে। ১২ জন সাধারণ মানুষকে ধরে ইউনিয়ন পরিষদের পাশের খালি জায়গায় লাইন করে পাকিস্তানি সেনারা ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। ১৬ জনের দলটির ৪ জন বেঁচে যান অলৌকিকভাবে– রতন কর্মকার, রাজ বল্লভ, প্রাণেন্দ্র ও শশীভূষণ।[১০৯] আর পাঁচ জনকে পাকিস্তানি বাহিনি সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তার মধ্যে দুইজনের নাম জানা যায়– ডা. ধীরেন্দ্রনাম চৌধুরী ও ডা. শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী। তাদের কেউ পরে ফিরে আসেননি।[১১০] শহিদের নাম হলো– গঞ্জেস চন্দ্র চৌধুরী, পিতা : গোপাল চন্দ্র চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; গিরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, পিতা : হরে কৃষ্ণ চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; শচীন চন্দ্র চৌধুরী, পিতা : হরে কৃষ্ণ চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পিতা : গিরেন্দ্র

নাথ চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; প্রদীপ কুমার, পিতা : ক্ষিতিশ চন্দ্র চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; মহাবীর চন্দ্র সাহা, পিতা : জগৎ চন্দ্র সাহা, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; নারায়ণ চন্দ্র মোহন্ত, পিতা : রামেশ্বর মোহন্ত, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; আনন্দ অধিকারী (সুটকু), পিতা : গৌর গোপাল অধিকারী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; রুক্কিনী কর্মকার, পিতা : হরি কর্মকার, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; গুপি কান্ত সাহা, পিতা : লক্ষী কান্ত সাহা, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; নিতু দত্ত, পিতা : বেণী দত্ত, গ্রাম ও ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; রঘু মোহন্ত, পিতা : বিপীন মোহন্ত, গ্রাম ও ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; সমর চৌধুরী, পিতা : যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, গ্রাম ও ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; হরিপদ অধিকারী, পিতা : বেণী মাধব অধিকারী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া; দুরাল চন্দ্র সাহা, পিতা : দিনেশ চন্দ্র সাহা, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া সদর; স্বপন চন্দ্র সাহা, পিতা : হরি লাল সাহা, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া সদর; রবীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, পিতা : তারা নাথ বিশ্বাস, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া সদর; মিহির কুমার সাহা, (বাস : বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া), ঝিকিরা, উল্লপাড়া, সিরাজগঞ্জ; দীজেন্দ্র চন্দ্র সাহা, পিতা : যদু নাথ চন্দ্র সাহা, ঝিকিরা, উল্লপাড়া, সিরাজগঞ্জ; পরেশ চন্দ্র শীল, পিতা : প্রকন্ন চন্দ্র সাহা, সেতাবগঞ্জ সুগারমিল, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।[১১১] এছাড়া পাকিস্তানি বাহিনি ঐ আক্রমণ সময়ে এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করে।

মাদলা গ্রামে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ

ফটকি ব্রিজ গণহত্যা

শাজাহানপুরের ফটকি ব্রিজ এলাকায় পাকিস্তানি হানাদাররা গণহত্যা চালায়। সেখানে ১২ জন মুক্তযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। হত্যার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা নিহতদের ব্রিজের নিচে ফেলে রেখে যায়। পরে তাদের আত্মীয় স্বজনরা এসে লাশগুলো নিয়ে যায়। তবে তাদের নাম জানা যায় নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঐ স্থানে মুক্তিযুদ্ধের সময় আরও একাধিক বার পাকিস্তানি বাহিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে আনা সাধারণ মানুষকে হত্যা করে লাশ নদীর মধ্যে ফেলে দিয়েছে।[১১২]

ফটকি ব্রিজ

শেরপুর উপজেলা

দড়িমুকুন্দ গ্রাম গণহত্যা

শেরপুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নে দড়িমুকুন্দ গ্রাম অবস্থিত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির সদস্যরা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে মুক্তিকামী বাঙালিদের হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল সোমবার দড়িমুকুন্দ গণহত্যা সংঘটিত হয়। ৭ জন পাকিস্তানি সেনা একটি দল এই গ্রামে হানা দেয়।[১১৩] তারা গ্রামের লোকজন ডেকে নিয়ে লাইন করে দাঁড় করিয়ে ২৪ জন স্বাধীনতাকামীকে গুলি করে হত্যা করে।[১১৪] যারা শহিদ হয়েছেন তাদের নামের একটি তালিকা তুলে ধরা হলো– আজহার আলী ফকির, ওসমান গনি ফকির , আজিজুর রহমান ফকির, একরামুল হক ফকির, সজির উদ্দিন, সেকেন্দার আলী, বুলমাজন আলী, রমজান আলী, মোখলেছার রহমান, ইছাহাক আলী, আবেদ আলী, আলিম উদ্দিন, ছোবাহান আলী, গুইয়া প্রামাণিক, দলিল উদ্দীন, হাছেন আলী, উজির উদ্দীন, আয়েন উদ্দীন, আফজাল হোসেন, মোহাম্মদ আলী, আজিম উদ্দীন, নেওয়াজ উদ্দীন, হায়দার আলী ও জপি প্রামাণিক।[১১৫] পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ভীতসন্ত্রস্ত লোকজন নিহতদের ঘটনাস্থলের পাশে গণকবর দেয়।

দড়িমুকুন্দ গ্রাম গণহত্যার স্মারক

শেরপুর কলেজ গণহত্যা

২৪ মার্চ ১৯৭১। পাকিস্তানি বাহিনি শেরপুরে প্রবেশ করে। রাজাকার ও আলবদরদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনি ওই দিন শেরপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ মানুষজনকে কলেজে ধরে আনেন। এলাকার মানুষদের যাদের পাকিস্তানি বাহিনি ধরে আনেন তাদের মনের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য কলেজে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর কলেজের সীমানার মধ্যে ১১ জনকে একসঙ্গে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে।[১১৬] শহিদের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য কলেজে কোন স্থাপনা নেই।

শেরপুর কলেজ

শেরপুরের কল্যাণী গণহত্যা

১৯৭১ সালের মে মাসের প্রথম শুক্রবার রাজাকার, আলবদরদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি কল্যাণী গ্রামটিকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলে লুটপাট, নির্যাতন ও গণহত্যা চালায়। সেদিন হানাদার বাহিনির গুলিতে অনেক নিরীহ ব্যক্তি নিহত হয়। তাদের অনেকেরই নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটি সংরক্ষণের জন্য নিরাপত্তা প্রাচীরসহ স্মৃতিস্তম্ভটি পুনর্নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

শিবগঞ্জ উপজেলা

মজুমদারপাড়া গণহত্যা

শিবগঞ্জ উপজেলার ময়দানহাটা ইউনিয়নের একটি গ্রাম মজুমদারপাড়া। গ্রামটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। স্থানীয় রাজাকাররা পাকিস্তানি সৈন্যের কাছে সংবাদ দেন যে মুক্তিবাহিনি মজুমদারপাড়ায় অবস্থান করছে। ফলে ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল গোবিন্দগঞ্জের কাটাখালি ব্রিজের কাছ থেকে সহস্রাধিক পাকিস্তানি হানাদার ভারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে মজুমদার পাড়ায় গণহত্যা শুরু করে। সে দিন যারা পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংস গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন তারা হলো– আব্দুস ছাত্তার (কমান্ডার), তুষার কান্তি মজুমদার (২৪), অরুনকান্তি (২২), পাঁচকড়ি (২২), সুরেশা (৫০), দিপুঘোষ (২০), চেরু ঘোষ (২৮), রমেনা (৪৫), করুনকান্তি (২৭), বনবাহাদুর (২৮), কালিপদ (৪০), ললিত সোনার (৩০), নরেশ (৩৫), কফিল (১৮) মোস্তফা (২৮), আঃ জোব্বার (৩০), আঃ বারী (২০) ও পরেশ (৩০)। এদের সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।[১১৭]

বামাচরণ মজুমদারের কাচারি ঘর যেখানে পাকিস্তানি বাহিনি নিরীহ মানুষকে এক সঙ্গে হত্যা করে।

পারআকলাই গণহত্যা

বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় ১৯৭১ সালের অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ হয়। তাদের অনেকেই আর ফিরে আসেন নি, হয়েছেন গণহত্যার শিকার। যারা ফিরে আসে নি তাদের মধ্যে শিবগঞ্জের মোকামতলা ইউনিয়নের পারআকলাই গ্রামের ডা. মো. তালেব একজন। তিনি ডাক্তার হিসেবে এলাকায় ছিল সুপরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তিনি যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধা ও নীরিহ মানুষের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। এলাকার রাজাকাররা তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনির কাছে অভিযোগ করেন। ফলে, পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেন নি। শিবগঞ্জে আরও অনেকে নিখোঁজ হয়েছেন, তাদের নাম জানা যায় নি।[১১৮]

বানাইল গ্রাম গণহত্যা

জুন মাসে পাকিস্তানি বাহিনি শিবগঞ্জের বানাইল গ্রামে প্রবেশ করে। ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথ মোহন্ত বাদলের দোকান আগুনে পুড়িয়ে দেয়। পোড়া দোকানটি পরে মেরামত করে আবারও তিনি সেখানে ব্যবসা শুরু করেন। এরই মাঝে মুসলিম লীগের কয়েকজন লোক তাকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু বৃদ্ধা মা, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও ছোট ৪ ছেলেমেয়েকে নিয়ে তিনি যেতে রাজি হননি। এরই মাঝে ১১ জুন তাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকে তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পাঁচপীর গ্রাম গণহত্যা

পাঁচপীর সরলপুর গ্রামের একটি পাড়া। এই পাড়াটি শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত। পাঁচপীর গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনি ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সম্মুখ লড়াইয়ে ১ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। এরপর পাকিস্তানি বাহিনি এলাকায় ব্যাপক অগ্নি সংযোগ করে। পাঁচপীরে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে পাকিস্তানি বাহিনি পাঁচপীরের অন্য অংশ যা গোকুল ইউনিয়ন বগুড়া সদর থানার মধ্যে পড়েছে সেখানে আক্রমণ করে এবং সেখানেও গণহত্যা সংঘটিত করে।[১১৯]

আদমদীঘি উপজেলা

আদমদীঘিতে মার্চ গণহত্যা

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর আদমদীঘির বাঙালিরা প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমে যায়। এ অবস্থায় সান্তাহার রেলওয়ে জি.আর.পি থানার বিহারি হাবিলদার হারুনের নেতৃত্বে বিহারি পুলিশরা থানার অস্ত্রগার থেকে অস্ত্র নিয়ে শহর পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে বাঙালিদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। তাদের ছোড়া গুলিতে ছাতনী গ্রামের জালাল হোসেন, ঢেকড়া গ্রামের মহাতাব উদ্দীন ও কেল্লাপাড়া গ্রামের আখের আলী মারা যান। তারা শহরের ইয়ার্ড কলোনীতে দেওয়ান আব্দুল মজিদ এবং যোগীপুকুর এলাকায় ডাঃ কিসমতের স্ত্রী ও শ্বাশুড়ীকে আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

খাঁড়ির ব্রিজ বাজার গণহত্যা

খাঁড়ির ব্রিজ শ্বশান ঘাট বাজার রহিম উদ্দিন ডিগ্রী কলেজের পাশে অবস্থিত। সেদিন ছিল হাট বার। পাকিস্তানি বাহিনি সকাল ১০টার দিকে খাঁড়ির ব্রিজ এলাকায় অভিযান চালায়। এলোপাথারি গুলি চালায় পাকিস্তানি বাহিনি। পাকিস্তানি বাহিনির গুলিতে যে সব মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন, তারা হলেন– চকসোনার গ্রামের আলতাফ হোসেন, কোমারপুর গ্রামের আব্দুল জলিল, চাঁপাপুর গ্রামের আনোয়ারুল হক টুলু ও একই গ্রামের আব্দুস সাত্তার।[১২০] পাকিস্তানি বাহিনি ওই দিন, 'স্বাধীনতা চাইলে মৃত্যু' বলে শ্লোগান দেয়।[১২১]

গোরগ্রাম/মোরগ্রাম গণহত্যা

১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনি মোরগ্রাম/গোরগ্রামে এলোপাথারি গুলি করে গ্রামবাসীর ওপর। ওই দিন পাকিস্তানি বাহিনি জালাল উদ্দিনসহ আরও বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে। পাকিস্তানি বাহিনির গুলিতে ওই দিন আহত হন– আব্দুর রউফ নূর। তার গলায় গুলি লেগেছিল। রবিউল উদ্দিনও ওই দিন পাকিস্তানি বাহিনির গুলিতে আহত হন। এছাড়া ওই দিনের আক্রমণে অনেকেই আহত হন।[১২২]

ছাতিয়ানগ্রাম গণহত্যা

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনি রাজাকারদের সহায়তায় আদমদীঘি উপজেলার ছাতিয়ানগ্রাম ও শালগ্রামে অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা চালায়। তারা ছাতিয়ান গ্রামে হেমন্ত বসাক, রুপভান, সমিনা বিবি, সুমল বসাক, চাঁন মোহাম্মাদ কে হত্যা করে।[১২৩]

সারিয়াকান্দি উপজেলা

নারচী ও গণকপাড়া গণহত্যা

২০ অক্টোবর সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী ও গণকপাড়া গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনির সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়।[১২৪] পাকিস্তানি বাহিনির আক্রমণের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ সময় মুক্তিবাহিনির খোঁজ না পেয়ে পাকিস্তানিরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন।[১২৫] এরপর ওই দিনই তারা নারচী ও গণকপাড়া গ্রামের কয়েকজন লোককে হত্যা করে।[১২৬] পরের দিন ২১ অক্টোবর পাকিস্তানি সেনারা আবার গ্রামে ঢুকে। তারা এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে বেশকিছু গ্রামবাসিকে হত্যা করে এবং বহু বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়।[১২৭]

টিউরপাড়া গণহত্যা

২১ অক্টোবর সারিয়াকান্দি থানার টিউরপাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি বাহিনি এই খবর পেয়ে টিউরপাড়ায় আক্রমণ করে। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভারী অস্ত্রের মুখে টিকতে না পাড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে যায়। এর পর ঐ দিন পাকিস্তানি সেনারা টিউরপাড়া গ্রামে প্রবেশ করে ১২ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে।[১২৮]

সারিয়াকান্দি থানা গণহত্যা

২৮ নভেম্বর সকালে হানাদার বাহিনি সারিয়াকান্দি থানায় আক্রমণ করে। তাদের গুলিতে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিলসহ আর এক শহিদ হন। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি বাহিনি থানা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ওয়াপদা রোড দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পাকিস্তানি বাহিনি বাড়ইপাড়ায় (সোনারপাড়া) মুক্তিযোদ্ধা মমতাজুর রহমান মুন্টুকে গুলি করে। শহিদ হন মুন্টু।[১২৯] ২৯ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের সারিয়াকান্দি থানা আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের অনেকে হতাহত হয় এবং ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।[১৩০] যে ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন তারা হলেন– মমতাজ উদ্দিন, মোজাম্মেল হক ও আব্দুল জলিল।[১৩১]

সোনাতলা উপজেলা

ঘোড়াপীরের মেলা গণহত্যা

সোনাতলা থানা থেকে জুমারবাড়ী যাওয়ার পথে ঘোড়াপীরের মেলা অবস্থিত। ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনারা ঘোড়াপীর মেলায়

এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে। ১লা বৈশাখ উপলক্ষে মাসব্যাপী ঘোড়াপীরের মেলা বসেছিল। পাকিস্তানি সেনাদের পথ দেখিয়ে মেলায় নিয়ে যায় রাজাকাররা। এই দিন পাকিস্তানি সেনা ঘোড়াপীরের মেলায় কমপক্ষে ২/৩ জনকে হত্যা করে।[১৩২] সবার নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। একজন শহিদের নাম শুকরো। তাঁর পিতার নাম আব্দুল জলিল। শুকরোকে পাকিস্তানি বাহিনি হত্যার পর টুকরো টুকরো করে কাটে।[১৩৩]

ঘোড়াপীরের মেলা

সোনাতলা রেলস্টেশন বাজার গণহত্যা

পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের দোসররা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সোনাতলায় নিরীহ মানুষজনকে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সোনাতলা রেলস্টেশন বাজারে ৩ জনকে পাকিস্তানি বাহিনি গুলি করে হত্যা করে।[১৩৪] যে ৩ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয় তাদের নাম জানা যায় নি। হত্যার পর তাদের রেলস্টেশনের পাশেই পুঁতে রাখা হয়।

সোনাতলা বন্দর গণহত্যা

পাকিস্তানি বাহিনি সোনাতলার বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে আশেপাশের এলাকায় অভিযান পরিচালনা করত। এই রকম একটি অভিযানে ৬ মে পাকিস্তানি বাহিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে ৩ জন লোককে ধরে এনে সোনাতলা বন্দরের নিকটস্থ বাজারে গুলি করে হত্যা করে।[১৩৫]যাদের হত্যা করা হয় তাদের নাম জানা যায় নি।

বধ্যভূমি
বগুড়া সদর উপজেলা

বাবুর পুকুর বধ্যভূমি

নূরজাহান বেগম[১৩৬] চাকরি করতেন বগুড়া টেলিফোন অফিসে অপারেটর পদে। অপারেটর হওয়ার কারণে যুদ্ধের দিনগুলোতে টেলিফোনে পাকিস্তান বাহিনির আদান-প্রদান করা প্রায় সব তথ্য তিনি জানতে পারতেন এবং তা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। তাই তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির টার্গেটে পড়েন। খান্দার এলাকার 'শান্তি কমিটি'র লোকজন নূরজাহান ও তার স্বামী আজিজার রহমান তোতার ওপরও নজর রেখেছিল। ১১ নভেম্বর গভীর রাতে রাজাকারদের দেখিয়ে দেয়া পথ অনুসরণ করে কয়েক শ' পাকিস্তানি সেনা চারদিক দিক থেকে নূরজাহানের বাড়ি ঘিরে ফেলে। বিশ রোজা শেষে একুশ রোজার জন্য ঘরে ঘরে সেহেরী খাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। পাড়ার অন্যদের মত নূরজাহানদের বাড়ির সব সদস্যও জেগেছেন। এক সময় সেহেরী খাওয়ার পর সবাই নিজেদের ঘরে শুয়ে পড়েন। উঠানের দক্ষিণের ঘরে নূরজাহান, তার স্বামী তোতা এবং দেড় বছর বয়সী কন্যা বিউটিকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। আর উত্তর দিকের ঘরে ৬ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সন্তান সম্ভাবা ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে শুয়ে ছিলেন তোতার প্রথম স্ত্রী জিন্নাতুন নেছা। রাত আনুমানিক ৪টার দিকে হঠাৎ বাড়ির সামনের সড়কে গাড়ির শব্দ পাওয়া যায়। এর একটু পরেই উঠানের পূর্ব দিকে বাঁশ দিয়ে আটকানো দরজা ভেঙে পাকিস্তানি হানাদাররা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনি আজিজার রহমান তোতার খোঁজে প্রথম স্ত্রী জিন্নাতুন নেছার ঘরে ঢুকে। তল্লাশি চালিয়ে তাকে না পেয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী নূরজাহানের অবস্থান জানতে চায়। তারা নূরজাহানের ঘরের কাছে পৌঁছার আগেই ঘরের ভিতরে থাকা

তোতা দ্রুত লুকিয়ে পড়ে। দরজা খোলার পর হানাদাররা নূরজাহানের কাছে তার স্বামীর অবস্থান জানতে চায়। 'তিনি ঘরে নাই'– এ কথা বলার পর হানাদার সৈন্যরা নূরজাহানের দু'টি হাত ধরে তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসেন। এরপর দড়ি দিয়ে দুই হাত বাঁধা হয়। নূরজাহানকে জিপে তুলে হানাদাররা অভিযানের জন্য এগিয়ে যায় ঠনঠনিয়া শহীদনগরের দিকে। কারণ, একাত্তরে নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ঠনঠনিয়া এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা নিজ এলাকার রাজাকারদের নির্মূলের পরিকল্পনা করেন। এজন্য তারা রণাঙ্গন থেকে গোপনে বাড়িতে আসতে শুরু করেন। ঠনঠনিয়ার পশারীপাড়ার বাসিন্দা পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মাহফুজুর রহমান ওরফে আব্দুল মান্নান, তার ভাই ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আব্দুল হান্নান ও ন্যাপ কর্মী ওয়াজেদুর রহমান টুকুর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ভিতরে ভিতরে সংগঠিত হতে শুরু করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত হওয়ার খবর এলাকার শান্তি কমিটির লোকজন তথা পাকিস্তানি সেনাদের কানে পৌঁছে দেন। নিজেদের রক্ষায় তারা মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সহায়তাকারীদের নির্মূলের পাল্টা ছক কষে। নূরহাজানকে আটক করার পর রাজাকাররা পাকিস্তানি বাহিনিকে নিয়ে ঠনঠনিয়ার শহিদ নগর, পশারীপাড়া, শাহ্পাড়া ও তেতুলতলা এলাকা ঘিরে ফেলে। ওই এলাকায় গিয়ে তারা একে একে মোফাজ্জল হোসেন আবুল, তার ছোট ভাই কিশোর আশরাফ আলী, বাবা গিয়াস উদ্দিন ওরফে গেদু শেখ, সাইফুল ইসলাম, ফজলুর রহমান, আব্দুস সবুর মন্ডল, জনাব আলী খন্দকার ও তার ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন খন্দকারকে হাত-পা বেঁধে ট্রাকে তোলে। এরপর একই কায়দায় পশারীপাড়া থেকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাহফুজুর রহমান ওরফে আব্দুল মান্নান, তার ভাই ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আব্দুল হান্নান, ন্যাপ কর্মী ওয়াজেদুর রহমান টুকু, মোশাররফ হোসেন, বাচ্চু শাহ্ ও সাবের হোসেন এবং শাহ্পাড়া থেকে আলতাফ হোসেন, বাদশা শেখ, বাচ্চু শেখ, মন্টু তার ভাই জালাল এবং অজ্ঞাতনামা আরও এক ব্যক্তিকে ট্রাকে তোলে।

তাদের যখন গাড়িতে তোলা হচ্ছিল তখন পাড়ার মসজিদ থেকে

ফজরের আজান ভেসে আসছিল। প্রায় আধা ঘণ্টা চলার পর ট্রাক থামিয়ে তাদের নামানো হয়। সেখানে সবাইকে লাইনে দাঁড় করানো হয়। পরে এক এক করে যাচাই-বাছাই শেষে দুই কিশোর ও তিন বৃদ্ধসহ ৭ জনকে বাদ দিয়ে নূরজাহানসহ ১৪ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় নাটোর-বগুড়া সড়কের পাশেই বাবুরপুকুর নামে একটি পুকুরের পাড়ে। এরপর সেখানে ওই ১৪ জনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়।[১৩৭]

বাবুর পুকুর বধ্যভূমিতে শহিদের নাম– মান্নান পশারী, হান্নান পশারী, সাইফুল ইসলাম, ওয়াজেদুল রহমান টুকু, জালাল মন্ডল, আব্দুস সবুর, আলতাফ আলী, বাদশা শেখ, বাচ্চু শেখ, ফজলুর হক খান, আবুল হোসেন, নূরজাহান বেগম (লক্ষ্মী)।[১৩৮]

প্রায় ৩৪ বছর গণকবরটি অবহেলায় পড়ে থাকার পর বগুড়াবাসীর দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে ২০০৫ সালে সেখানে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। এর আগে বগুড়া প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে ১৪ জন শহিদের নাম উল্লেখ করে শহিদের কবরগুলো পাকা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে বগুড়া প্রেসক্লাব ও বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সহযোগিতায় এবং বগুড়া জেলা পরিষদের আর্থিক অনুদানে বাবুরপুকুরে একটি স্মৃতিস্তম্ভ করা হয়েছে।[১৩৯]

বাবুর পুকুর বধ্যভূমি

বাবুর পুকুর গণকবরে শায়িত শহিদগণের নাম

বগুড়ার রেলস্টেশন বধ্যভূমি

১৯৭১ সালের ৩০ এপ্রিল শুক্রবার বগুড়া রেল কলোনীর পুকুরপাড়ে ৭ জনকে গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনি।[১৪০] বগুড়া শহরের চক সূত্রাপুর এলাকা থেকে তাদের ধরে আনা হয়। রেল কলোনীতে একটি পুকুর পাড়ে তাদের লাশ পুঁতে রাখা হয়। ২০০২ সালে সেখানে শহিদের স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। স্মৃতিসৌধটি এখন অযত্নে আর অবহেলায় রয়েছে। রিকশাস্ট্যান্ডে পরিণত হয়েছে বগুড়া রেলস্টেশন এলাকার বধ্যভূমি। শহিদ মিনারের আদলে ইট-সিমেন্টে নির্মিত হয়েছে বগুড়া শহরের শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের বেদি। স্তম্ভের ওপরে শহিদের নামফলক মুছে গেছে অনেক আগেই। বেদির ওপর দিয়ে ফাঁকা সুড়ঙ্গপথ। সেই পথে সামনে পা বাড়ালেই একাত্তরের শহিদের স্মৃতিবিজড়িত বধ্যভূমি। সুড়ঙ্গপথটি তৈরি হয়েছে স্থানীয় রেলবস্তির লোকজনের চলাচলের জন্য। বধ্যভূমির বেদি ঘেঁষে চটের তৈরি শৌচাগার বানিয়েছেন স্থানীয় ব্যক্তিরা। এদিকে বধ্যভূমির মাত্র ২০ গজ দূরেই শহরের ব্যস্ততম স্টেশন সড়ক। সেই রাস্তার প্রায় পুরোটাই দখল করে গড়ে উঠেছে ভাঙারির দোকান, রিকশা-টেম্পো গ্যারেজ।[১৪১] জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বা জেলা প্রশাসন স্মৃতিসৌধটি সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।[১৪২]

বগুড়ার রেলস্টেশন বধ্যভূমির বর্তমান রূপ

এস.ডিও'র বাংলো বধ্যভূমি

শহরের সেউজগাড়ি এলাকায় রেলওয়ে ষ্টেশনেই ছিল এস.ডিও এর বাংলো। এই বাড়িটির দোতলা ব্যবহার করতো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি। রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনারা বাঙালিদের এখানে নিয়ে এসে জবাই করে হত্যা করতো। বাংলো সংলগ্ন একটি কুয়োতে এই লাশ ফেলে দেওয়া হতো। তবে বাংলোর বাইরের একটি রান্না ঘরের কাছে সবচেয়ে বেশি নরহত্যা হতো। কারণ রান্না ঘর থেকে কুপটির দুরত্ব ছিল মাত্র ২০ গজ। ঘাস আর জঙ্গলে ভরা এই বাংলোতে পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকাররা নিরীহ মানুষদের হত্যা করে পৈশাচিক আনন্দ পেত। নিরীহ মানুষদের আত্মচিৎকার বাড়িটির বাইরে পৌঁছাতো না। বগুড়া রেল ষ্টেশনের সুইপার দাশীন (৭৪) তার মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন 'আমি এস.ডিও বাংলোর একজন নীরব স্বাক্ষী।' তিনি আরও বলেন, আমার হাতেই কমপক্ষে চার থেকে পাঁচশো লাশ এই কুয়োতে ফেলেছি। হানাদার বাহিনিরা তাকিয়ে দেখতো, আমি কি করি। আমি লাশ গুলো পুঁতে রাখতে চাইতাম। কিন্তু ওরা দেয় নাই।' ওরা আমাকে বলতো, 'তু শালা হিন্দু হ্যায়'। পাকিস্তানি সেনারা নিরীহ বাঙালিদের ধরে এনে হাত বেঁধে মুখের ভেতর কাপড় ঢুকিয়ে দিতো। তারপর তাদের পেটে চাকু ঢুকিয়ে বা জবাই করে হত্যা করতো। এস.ডিও এর বাংলোর দোতলার ঘরটি ছিল বর্বরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ঘরটিতে এতো নরবলি হয়েছে, এই ঘরের দেয়াল ও মেঝেতে রক্ত পুরু হয়ে জমাট বাঁধা ছিল। রক্ত জমতে জমতে এতটাই জমাট বেঁধে গিয়েছিল যে কোদাল দিয়ে সেই রক্ত সরানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। বগুড়া শত্রুমুক্ত হবার আগ পর্যন্ত এস.ডিও'র বাংলোতে কোন মুক্তিযোদ্ধা প্রবেশ করতে পারেনি।[১৪৩] বগুড়ার রেলওয়ে স্টেশনের এসডিও বাংলো বধ্যভূমির সংরক্ষণে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। তবে সম্প্রতি আকবর আহমদ ও জুয়েলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন খনন কাজ করে অনেক কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছে। এই দুইজন খনন কাজে নেতৃত্ব দেন।

এসপির বাগান বধ্যভূমি

এসপির বাগান বধ্যভূমি অন্য নাম গাঙ্গুলির বাগান বধ্যভূমি। বগুড়ার শহরতলী সেউজগাড়ির এলাকার শেষ মাথায় এক সারিতে

ঐতিহাসিক তিনটি বাগান ছিল। এই বাগানগুলো এসপির বাগান বা গাঙ্গুলির বাগান নামে পরিচিত। পূর্বদিকে গণমঙ্গল, পশ্চিমে আনন্দ আশ্রম, মাঝখানে গাঙ্গুলি বাগান। এটি আকবর আলী সরকার নামে এক এসপির বাগানবাড়ি। এই বাগানবাড়ির আয়তন ছিল নয়বিঘা। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকায় বসতবাড়ি কম ছিল এবং এলাকাটি ছিল খুবই নির্জন। এই বাগানের সামনে কিছু দূরেই সরকারি আজিজুল হক কলেজের অবস্থান। বাগানের একদিকে একটি মাটির ঘর ছিল। সামনে ছিল পাঁতকুয়ো। কলেজের কাছে হওয়ায় বেশ কয়েকজন ছাত্র এই মাটির ঘরকে মেস হিসাবে ব্যবহার করতো। ছাত্ররা এই পাতকুঁয়োর পানি পান করতো। যুদ্ধ শুরু হলে মেসের ছাত্ররা পালিয়ে যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হানাদারেরা এসপির বাগানে একটি ক্যাম্প গড়ে তোলে। এখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি গোলাবারুদ ও খাদ্যের রসদ রাখতো। রাজাকাররা সাধারণ মানুষদের ধরে এনে পাকিস্তানি হানাদারের হাতে তুলে দিতো। এখানে পাকিস্তানি সেনারা তাদের হত্যা করে পাতকুঁয়োয় ফেলে দিতো।[১৪৪]

এসপির বাগান

বগুড়ার সাধুর আশ্রম বধ্যভূমি

বগুড়া সদরের সেউজগাড়ী এলাকার জায়গাটিতে যেখানে ৭১ সালে গণহত্যা সংঘটিত হয় বলে এখন সাধুর আশ্রম নামেই পরিচিত।

১৯৭১ সালে ওই সাধুর আশ্রমে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে ৩ সাধুকে। এরা হলেন– সুন্দর সাধু, মঙ্গল সাধু ও মুনেন্দ্রনাথ সরকার। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী জানান, সেউজগাড়ী সাধুর আশ্রমের পাশে একটি কূপ ছিল। সেখানে পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার পক্ষের লোকদের ধরে নিয়ে এসে গুলি অথবা জবাই করে হত্যা করে ফেলে দেয়। তিনি আরো জানান, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনি বগুড়া দখল করার পরও সাধুরা আশ্রম ছাড়েনি। সাধুদের ধারণা ছিল ধর্মীয় স্থানে অন্তত কেউ কোন হত্যাযজ্ঞ চালাবে না। কিন্তু তাদের সেই ধারণা পাল্টে দিলো পাকিস্তানি বাহিনি। হঠাৎ সেউজগাড়ী সাধুর আশ্রমে পাকিস্তানি বাহিনি অভিযান চালায়। তখন সাধুরা খাচ্ছিলো। পাকিস্তানি সেনারা ৩ সাধুকে গুলি করে হত্যা করে। পরে তাদের মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে পুঁতে রাখে।[১৪৫] এখনও ওই সব শহিদ সাধুদের কোন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়নি।

বগুড়ার সাধুর আশ্রম

বগুড়া রেল স্টেশনের পশ্চিম দিকে ডিগ্রি কলেজ বধ্যভূমি

গাঙ্গুলির বাগান থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান সাধু বাবা যুগল কিশোর গোস্বামী। তার কাছ থেকে জানা যায়, হানাদার পাকিস্তানি বাহিনি বগুড়া দখল করার পরও আশ্রমে চারজন সাধু ও তিনজন মাতা ছিলেন। হানাদার বাহিনি তিনজন সাধুকে বগুড়া রেল স্টেশনের পশ্চিম দিকে ডিগ্রি কলেজ সড়কের পাশে গুলিকরে হত্যা করে।[১৪৬]

বগুড়া রেল স্টেশনের পশ্চিম দিকে ডিগ্রি কলেজ বধ্যভূমির বর্তমান অবস্থান

বগুড়া ফুলবাড়ী বধ্যভূমি

বগুড়া শহরের আযিযুল হক সরকারি কলেজের (পুরাতন ভবন) পাশেই ফুলবাড়ী উত্তরপাড়া। ফুলবাড়ীর পাশেই ওয়াপদা ভবন ও রেস্ট হাউজে ছিল পাকিস্তানি বাহিনি ক্যাম্প। ১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল হঠাৎ পাকিস্তানি বাহিনি ফুলবাড়ী উত্তরপাড়া ঘেরাও করে। ঘরে ঘরে ঢুকে ধরে নিয়ে আসে।[১৪৭] তাদের করতোয়া নদীর পাশে আমতলায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। এরা হলেন–

নাসির উদ্দীন প্রাং, নূর আলম, আব্দুল জব্বার মোল্লা, শাজাহান আলী ফকির, অমেদ আলী খান, মোজাফফর আলী মন্ডল, আমজাদ হোসেন ধলু, ফয়েজ উদ্দীন, তমেজ আলী মন্ডল, আব্দুর রহমান শেখ, নুরুল ইসলাম, জয়েন উদ্দীন শেখ, ইসমাইল হোসেন, বুদু মিয়া, শুটকু ফকির, রোস্তম আলী প্রাং, মনজুর আলী, সবেদ আলী মোল্লা, হাবিবুর রহমান প্রাং, জাহিদুর রহমান খন্দকার, আকবর আলী মোল্লা, ইনসান আলী মৃধা, মোকসেদ উদ্দীন, মমতাজ উদ্দীন খন্দকার, হাবিবুর রহমান মুন্সি, আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী, শহিদ কসিম উদ্দীন, বশারতুল্লাহ খা, (বুদা খা), শহিদ মুকুল ফকির, মোহাম্মদ আলী, ফজলার রহমান, আফজাল পাইকার, সেকেন্দার আলী।[১৪৮] ফুলবাড়ী এলাকার ৬০ বছরের পান দোকানদার হেলাল উদ্দীন জানান, পাকিস্তানি বাহিনিরা ঐ

বগুড়া ফুলবাড়ী গ্রামে গণহত্যার শিকার শহিদের নাম ফলক

দিন ঘরে ঘরে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে লোকজনকে ধরে নিয়ে এসে আমবাগানে গুলি করে হত্যা করে। সেই আমবাগানে স্মৃতি চিহ্ন না থাকলেও সরকারি আযিযুল হক কলেজের (পুরাতন ভবন) পাশে মসজিদের এক কোনায় শহিদের নামের একটি তালিকাসহ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে।

ওয়াপদা বধ্যভূমি

ওয়াপদা ভবন ও রেস্ট হাউজে পাকিস্তানি বাহিনি নীরিহ মানুষজনকে ধরে নিয়ে আসত এবং মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস প্রায় প্রতিদিনই বধ্যভূমিতে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হতো।[১৪৯] তবে কত মানুষকে এই বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই। এমনকি বধ্যভূমির স্থানটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমান ওয়াপদা

সার্কিট হাউজ বধ্যভূমি

বগুড়া শহরে অবস্থিত সার্কিট হাউজটিকে পাকিস্তানি বাহিনি একটি বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল। বাঙালিদের জন্য সার্কিট হাউজ আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল। এই বধ্যভূমিতে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকা থেকে গাড়িতে করে বাঙালিদের ধরে আনা হতো। এই সব নিরীহ বাঙালিদের বেশির ভাগকে হত্যা করা হতো সার্কিট হাউজ মাঠে। পরে

তাদেরকে ওই জায়গায় গণকবর দেওয়া হতো।[১৫০] মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসই সার্কিট হাউজে গণহত্যা সংঘটিত হয়।

জামিলের গোডাউন বধ্যভূমি

বগুড়া শহরের 'জামিল গ্রুপ অব কোম্পানিজ'-এ পাকিস্তানি বাহিনি ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল। এটির বর্তমান অবস্থান জামিল নগরের জান-ই-শাবা হাউজিং সংলগ্ন।[১৫১] এই কোম্পানিতে বাঙালি শ্রমিকের তুলনায় বিহারি শ্রমিক বেশি ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশাম্‌স কোম্পানির বাঙালি শ্রমিক ছাড়াও শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধারণ মানুষকে ধরে এনে হত্যা করত।[১৫২] এ হত্যাকাণ্ডগুলো জামিল কোম্পানির গোডাউনের মধ্যে সংঘটিত হতো। যাদের হত্যা করা হতো তারা সবাই বগুড়া সদরের বাসিন্দা ছিল।[১৫৩] টিএম মুসা বলেন, জামিল গোডাউনের মধ্যে নীরিহ মানুষকে হত্যা করা হতো। তবে, তাদের কোথায় গণকবর দেওয়া হয়েছে তা আজও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।[১৫৪]

জামিলের গোডাউনের বর্তমান অবস্থা

লিচুতলার বধ্যভূমি

বগুড়া-শেরপুর মহাসড়কের পশ্চিম দিকে মাদলা ইউনিয়নের লিচুতলায় আফসার সরকারের বাড়িতে গণহত্যা চালানো হয়। বাড়ির সবাইকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস মুক্তিকামী মানুষদের হত্যা করে এ বাড়ির খুলিতে লাশ স্তুপ করে রাখা

হতো।[১৫৫] বাড়িটি বর্তমানে লিচুতলা মসজিদের পিছনে। ঐখানে একটা বড় কূপ ছিল যেখানে মানুষজনকে ফেলে দেওয়া হতো। মসজিদের এক্সটেনশনের ফলে কূপটি বর্তমানে বিলুপ্ত।[১৫৬]

লিচুতলার মসজিদের পিছনে এখানে মানুষ হত্যা করা হতো

চকলোকমান বধ্যভূমি

বেজোড়া ঘাটের দক্ষিণে রয়েছে একটি বধ্যভূমি। পাকিস্তানি বাহিনি এখানে গণহত্যা সংঘটিত করে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ২৩ জনকে ধরে এনে একসঙ্গে এখানে হত্যা করে। এদের কোনো পরিচয়

চকলোকমান বেজোড়া ঘাট

পাওয়া যায় নি।[১৫৭] অন্য একদিন ৯ জন মুক্তিযোদ্ধাকে করতোয়া নদীর পাশে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে রাখে পাকিস্তানি বাহিনি। চকলোকমানেরএই জায়গায় নাম পরবর্তী সময়ে শহীদনগর দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ এই নামে আর ওই স্থানের নাম কেউ ডাকে না।[১৫৮]

এতিমখানা বধ্যভূমি

বগুড়া এতিমখানার মধ্যে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরীহ মানুষজনকে ধরে এনে হত্যা করত। স্থানীয় জনগণের ভাষ্যমতে, পাকিস্তানি বাহিনি তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর ও আলশামসের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এতিমখানায় সাধারণ মানুষকে হত্যা করে।[১৫৯]

বগুড়া এতিমখানা

পাঁচপীরের মাঠ বধ্যভূমি

মহাস্থানগড় থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিম গোকুল ইউনিয়নের পাঁচপীরের মাঠে পাকিস্তানি বাহিনি মধ্য অগ্রহায়নে বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। পাকিস্তানি বাহিনির এই অভিযানে সহায়তা করে তাদের এদেশীয় রাজাকাররা। পাঁচপীরের মাঠ বধ্যভূমিতে নয় মাসে ঠিক কতজনকে হত্যা করা হয় তার সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি।[১৬০]

ভার্জিনিয়া টোব্যাকো মিল বধ্যভূমি

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বগুড়ার ভার্জিনিয়া টোব্যাকো মিলকে একটি বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহৃত করা হতো। এই বধ্যভূমিতে মিলের বাঙালি শ্রমিকসহ বাইরের অনেককেই ধরে নিয়ে এসে হত্যা করা হতো। মিল চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, সোপ ফ্যাক্টারির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে, পাওয়ার সেকশন সংলগ্ন গুদামের সামনে ও বয়লার সংলগ্ন স্থানে এসব বধ্যভূমি রয়েছে।[১৬১] এই বধ্যভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ চালাকালীন প্রায় প্রতিদিনই সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকদের ধরে এনে হত্যা করে মিলের বিভিন্ন এলাকায় ফেলে রাখা হতো।

চকসূত্রাপুর বধ্যভূমি

বগুড়া শহরের চকসূত্রাপুর থেকে এক দল মুক্তিকামী মানুষ ধরে নিয়ে এসে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে ফেলে রেখে যায় পাকিস্তানি বাহিনি। দুই পরিবারের ৫ জনসহ প্রায় ২০ জনকে গুলি করে। যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে– আলহাজ্ব হানিফ উদ্দিনের তিন ছেলে তৎকালীন এজি অফিস ঢাকার অডিটর আব্দুস, মৌলানা আব্দুল কাদের এবং আব্দুস সাত্তার। এছাড়াও সমবায় সমিতির অবসরপ্রাপ্ত জেল পরিদর্শক আব্দুল গনি ও তার ছেলে আব্দুল মতিন সুজা। এছাড়াও এক জনের নাম জানা গেছে তিনি হলেন) মেহের আলী শেখ বাচ্চা। স্বাধীনতার পর স্থানটি বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে, যত্নের অভাবে ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্যে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। বধ্যভূমিটি রক্ষার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা দাবি জানিয়েছেন।[১৬২]

কৈচড় স্কুল বধ্যভূমি

কৈচড় স্কুল বধ্যভূমি ফাঁপোর ইউনিয়ন অবস্থিত। এখানে পাকিস্তানি একদিন ২৬ জন নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে।[১৬৩] যাদের হত্যা করা হয় তাদের দূরবর্তী কোথাও থেকে ধরে আনা হয়। কৈচড়া স্কুল বধ্যভূমিতে যারা শহিদ হন তাদের পরিচয় পাওয়া যায় নি।

ধুনট উপজেলা

জননী রাইস মিল বধ্যভূমি

ধুনট উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজনকে ধরে নিয়ে এসে একদিনে ৭ জন নিরীহ বাঙালিকে পাকিস্তানি বাহিনি জননী রাইস মিলের দক্ষিণ পাশে হত্যা করে।[১৬৪] পাকিস্তানি বাহিনি এ গণহত্যা সংঘটিত করে তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর ও আলশামসদের সহযোগিতায়। পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের সহযোগীরা এ উপজেলায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

জননী রাইস মিল

দুপচাঁচিয়া উপজেলা

পদ্মপুকুর বধ্যভূমি

দুপচাঁচিয়া-তালোড়া রাস্তার ভেলুরচক মোড়ে পদ্মপুকুরে একটি বধ্যভূমি আছে। পাকিস্তান বাহিনি রাজাকারদের সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ১লা রমজান রাতে ১০-১২ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে এই বধ্যভূমিতে। স্থানীয় জনগণ শহিদের একটি গর্তে পুঁতে রাখে। পদ্মপুকুর বধ্যভূমিতে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের পরিচয় তুলে ধরা হলো– রবিয়া মন্ডল, পিতা : শরবদী মন্ডল, গ্রাম: কেউৎ, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া; মকবুল মন্ডল, পিতা : মরিয়া মন্ডল, গ্রাম: কেউৎ, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া; আবদুস সালাম, পিতা : রবিয়া মন্ডল, গ্রাম: কেউৎ, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া; তছলিম উদ্দিন, পিতা : তছির উদ্দিন, গ্রাম: কুড়াহার, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া।[১৬৫]

পদ্মপুকুর বধ্যভূমি

দুর্গাদহ নদীর তীর বধ্যভূমি

পাকিস্তানি সৈন্যরা দুপচাঁচিয়া তালোরের দুর্গাদহ নদীর তীরে (এটি নাগর নদ রেল সেতু নামেও পরিচিত) মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে অসংখ্য মানুষ হত্যা করে। দুর্গাদহ নদীর তীরে পাকিস্তানি বাহিনি একটি মাঁচা বানিয়েছিল।[১৬৬] বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক ধরে নিয়ে এসে নদীর দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করত। কোনো কোনো সময় হাত-পা বেঁধে জীবন্ত মানুষকে পানির মধ্যে ফেলে দিতো।[১৬৭]

দুর্গাদহ নদী

গাবতলী উপজেলা

সুখান পুকুর বধ্যভূমি

গাবতলী থানার সুখান পুকুরের একটি বধ্যভূমি রয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস একাধিক বার এই স্থান সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়।[১৬৮] পাকিস্তানি বাহিনির সুবেদার মেজর হানিফের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনি সুখান পুকুরে নারকীয় তান্ডব চালায়।[১৬৯]এ বধ্যভূমিতে আশেপাশের গ্রাম ছাড়াও কামুইল ও ঘোনা প্রভৃতি এলাকা থেকে নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে ফেলে রাখতো।[১৭০]

কাহালু উপজেলা

মুরইল ইসলামিয়া মাদ্রাসা বধ্যভূমি

কাহালু থানার মুরইল ইসলামিয়া মাদ্রাসায় পাকিস্তানি সেনারা রাজাকারদের সহায়তায় আশপাশের অঞ্চল থেকে লোকজনকে ধরে নিয়ে আসতো। রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনি মাদ্রাসার দপ্তর মুকুল বাহারকে পশুর মতো নির্মমভাবে অত্যাচারের পর গুলি করে। হত্যার পর তার লাশ মাদ্রাসার পাশের পুকুরে ফেলে দেয়।[১৭১]

শাজাহানপুর উপজেলা

মাসুদনগর বধ্যভূমি

শাজাহানপুর থানার আড়িয়া পালপাড়া গ্রাম। ১৯৭১ সালের ১৫ মে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি ৭ জনকে সেখানে হত্যা করে। এরা হলেন– শহিদ মাসুদ, ফনিন্দ্রনাথ দেব, তপন পাল, সুরেশ পাল, খোকা বৈরাগী, মুনিরসহ অজ্ঞাত একজন। গুলি করে হত্যার পর পাকিস্তানি বাহিনি তাদের লাশ আড়িয়াবাজারের পাশের রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যায়। স্বাধীনতার পর এলাকাবাসী মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মাসুদের নামানুসারে আড়িয়াবাজারের নাম মাসুদনগর রাখে। আড়িয়াবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ছিল পাকিস্তানি বাহিনির ক্যাম্প।[১৭২]

শহিদ মাসুদের নামে স্থাপিত নামফলক

মাঝিড়া সেনানিবাসের বধ্যভূমি

২৯ মে শনিবার পাকিস্তানি বাহিনি বগুড়া শহর থেকে অনেকে ধরে নিয়ে যায় মাঝিড়া সেনানিবাসে। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে সাধারণ মানুষকে সে থানায় ডেকে নিয়ে যায়। যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের বলা হয় একটা তদন্ত আছে যা সম্পূর্ণ করে এক্ষুনি তারা ফিরে আসবেন। কিন্তু তারা আর ফিরে আসেন নি। বগুড়ার দক্ষিণে মাঝিড়াস্থ সেনানিবাসের বধ্যভূমিতে ডা. কসিরউদ্দীন তালুকদারসহ ১১ জনকে পাকিস্তানি বাহিনি হত্যা করেছিল।[১৭৩]

শেরপুর উপজেলা

বাগড়া কলোনি বধ্যভূমি

বগুড়া জেলা শেরপুরের কুসুম্বী ইউনিয়নে একটি বধ্যভূমি রয়েছে যার নাম বাগড়া কলোনি বধ্যভূমি। এখানে ১১টি বিহারি কলোনি ছিল। বাগড়া কলোনিতে স্বাধীনতাকামী গ্রামবাসী মিছিল নিয়ে রাস্তায় বের হলে সে সময়ে পাকিস্তানি বাহিনি নির্মম গণহত্যা চালায়। সদর আলী সরকারসহ গ্রামের ২ শতাধিক লোক বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে মিছিল নিয়ে গ্রামের পাশের প্রধান সড়কে যান। এ দেশের স্বাধীনতাবিরোধী চক্র এ খবর পাকিস্তান সেনাদের কাছে পৌঁছে দেয়। দুপুর ১২টাই পাকিস্তানি বাহিনি এসে মিছিলকারীদের ঘেরাও করে। পরে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় মনছেরের ভাটায়। ভাটার ভেতর তাদের লাইন করে বসিয়ে রাখা হয়। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরোচিত কায়দায় হত্যা। প্রথমে বসে থাকা স্বাধীনতাকামী অসহায় মানুষদের ওপর বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এপর আহতদের ওপর চালানো হয় মেশিনগানের গুলি। যে ইটের ভাটায় রাতদিন লেলিহান শিখার উদগীরণ হতো, সেই ভাটা নিমেষেই শহিদের রক্তে সিক্ত হলো।

এ ঘটনায় প্রায় ৫০-৬০ জন বাঙালি শহিদ হন। তবে গ্রামের পূর্বপাশে একটি ভিটায় এক জায়গায় ১০-১২ জনকে কবর দেয়া হয়েছে বলে গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন। এ স্থানটি চিহ্নিতও করা হয়নি।[১৭৪] এই বধ্যভূমিতে ২৮ জনকে হত্যা করার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন– আফজাল হোসেন, গণি, মোনসের আলী, দুলু মণ্ডল, জহির উদ্দিন মণ্ডল, মোফাজ্জল ফকির, নবা ফকির, সূরুজ আলী, হযরত, আফসার মন্ডল, সেফাত মণ্ডল, ইদ্রিস।[১৭৫] শরকত মন্ডল, আলতাফ সেখ, কুদ্দুস, হোসেন, খোকা, ঈমান, রিয়াজ উদ্দিন, যদিমুদ্দিন, সদর আলী সরকার।[১৭৬] জোবেদা আক্তারের স্বামী :সাত্তার মণ্ডল, শ্বশুর আজিজার মণ্ডল, বাবা আয়েজ উদ্দিন মণ্ডল এবং ভাই আকবর আলী।[১৭৭] এছাড়া গোসাই বাড়ি এলাকার কয়েকজন এখানে শহিদ হয়।[১৭৮] এ ঘটনার পর বাগড়া কলোনীটি পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে।[১৭৯]

বাগড়া কলোনি বধ্যভূমি

ঘোগাব্রিজ বধ্যভূমি

শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ঘোগাব্রিজ বধ্যভূমি অবস্থিত। পাকিস্তানি সেনারা ঘোগাব্রিজ এলাকায় প্রায় ৩শত জন স্বাধীনতাকামীকে হত্যা করে। এপ্রিলের কোনো একদিন পাকিস্তানি সেনারা ঘোগাব্রিজ এলাকায় আক্রমণ করে। স্বাধীনতার এতদিন পরেও শহিদের গণকবরগুলো সংরক্ষণে প্রশাসন কার্যকারী কোনো উদ্যোগ নেয়নি।[১৮০]

গোপালপুর বধ্যভূমি

খানপুর ইউনিয়নের খাগা হিন্দুপাড়ায় গোপালপুর বধ্যভূমি অবস্থিত। গোপালপুর এলাকায় ১৮ থেকে ২০ জন স্বাধীনতাকামীকে হত্যা করে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি একদিন পাকিস্তানি সেনারা গোপালপুর এলাকায় আক্রমণ করে। শহিদের গণকবরগুলো সংরক্ষণে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।[১৮১]

শিবগঞ্জ উপজেলা

চৌকিরঘাট বধ্যভূমি

চৌকিরঘাট মোকামতলা থেকে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এটি বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের একটি ব্রিজের পাশে অবস্থিত। ১৯৭১ সালে চৌকিরঘাটে পাকিস্তানি বাহিনির একটি চেকপোস্ট ছিল। এই

পথে যারা যাতায়াত করত পাকিস্তানি বাহিনি তাদের সবাইকে চেক করত। পাকিস্তানি সৈন্যদের যার প্রতি সন্দেহ হতো তাদের ধরে উল্টো করে ঝুলিয়ে পেটের মধ্যে বন্দুক ঢুকে দিতো। এলাকার কাউকে ব্রিজের আশেপাশে ঘেষতে দিত না পাকিস্তানি সৈন্য। তারা আশেপাশের গ্রামে নিয়মিত আক্রমণ করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা আহমদকে বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে পঙ্গু করে দেয়। আব্দুল রাজ্জাক বুলু ও জোবেদ আলীকে গুলি করার জন্য লাইনে দাঁড় করায় কিন্তু পরে তাদের ছেড়ে দেয়। পাকিস্তানি বাহিনি যাদের হত্যা করত তাদের চৌকিরঘাট ব্রিজের পাশে এবং বর্তমানে যেখানে পাট কল স্থাপিত হয়েছে সেখানে ফেলে রাখা হতো। মুক্তিযোদ্ধা মো. আবু বক্কর সিদ্দিক চৌকিরঘাট বধ্যভূমিতে ঠিক কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে বলেন, 'চৌকিরঘাটে সহস্রাধিক মানুষকে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়'।[১৮২]

চৌকিরঘাট ব্রিজ

আদমদীঘি উপজেলা

খাঁড়ির ব্রিজ শ্বশান ঘাট বধ্যভূমি

খাঁড়ির ব্রিজ শ্বশান ঘাটে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে হাত বেঁধে শ্বশান ঘাটে গুলি করে হত্যা করে। এর কয়েকদিন পূর্বেই পাকিস্তানি বাহিনি তাদের ধরে নিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে গ্রেনেডসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র পাওয়ায় তাদের শ্বশান ঘটে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।[১৮৩]

খাঁড়ির ব্রীজ শ্বশান ঘাট বধ্যভূমি

থলবড়বরিয়া বধ্যভূমি

পাকিস্তানি বাহিনি হঠাৎ ঘন কুয়াশার মধ্যে থলবড়বরিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণে পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। পাকিস্তানি বাহিনিকে তাদের দালালরা খবর দিয়ে নিয়ে আসে। পাকিস্তানি বাহিনির গুলিতে যারা শহিদ হন তাঁরা হলেন– আব্দুল লতিফ, গ্রাম : পুসিন্দ, ইউনিয়ন : নশরতপুর, উপজেলা : আদমদীঘি। আক্কাশ আলী, গ্রাম : মরইল উত্তরপাড়া, ইউনিয়ন : নশরতপুর, উপজেলা: আদমদীঘি। আজিজার রহমান, গ্রাম : চাটঘোইল, ইউনিয়ন: নশরতপুর, উপজেলা : আদমদীঘি। এছাড়া মটপুকুরীয়ার একজন শহিদ হন।[১৮৪]

সুদিন ব্রিজ বধ্যভূমি

আদমদীঘি উপজেলার সুদিন রেল ব্রিজ এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনি আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে অনেক মানুষকে হত্যা করে। তার মধ্যে ৯ জনের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সুদিন ব্রিজ বধ্যভূমি

সোনাতলা উপজেলা

রাণীরহাট বধ্যভূমি

সোনতলা উপজেলা থেকে ৭-৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাণীরহাট বধ্যভূমি অবস্থিত। সোনাতলার বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধারণ মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাণীরহাট বধ্যভূমিতে হত্যা করা হতো। বাইগুনির[১৮৫] অধিবাসী মো. সাত্তার ফিল্লম্যানকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাণীরহাট বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়।[১৮৬] রাণীরহাট কোন জায়গায় এই বধ্যভূতি তা এখনও চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নি।

গোপালবিল বধ্যভূমি

সোনাতলা উপজেলা হাই স্কুলের পিছনে গোপালবিল বধ্যভূমি অবস্থিত। এই বধ্যভূমিতে পাকিস্তানি বাহিনি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসব্যাপী সাধারণ মানুষকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করত।[১৮৭] এই বধ্যভূমিতে ঠিক কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তার পরিসংখ্যা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। এই বধ্যভূমিতে কোন স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয় নি।

গোপাল বিল

গণকবর
বগুড়া সদর উপজেলা

আমতলা গণকবর

বগুড়া শহরের উত্তরে ফুলবাড়ীর করতোয়া নদীর তীরে আমতলা এলাকাটির অবস্থান। এটি আজিজুল হক কলেজের পুরাতন ভবনের পিছনে। এখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনি নিরীহ মানুষদেরকে হত্যা করে পুঁতে রাখে। এটি আমতলা গণকবর নামে পরিচিত। যা একটি বিশাল আকৃতির পাকুড় গাছের ছায়াতলে অবস্থিত। ১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা ৩৩ জনকে ধরে নিয়ে এসে আমতলা ঘাটের ছোট বালুঘাটে একসঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। গুলি করার পর কারো কারো লাশ নদীতে ভেসে যায়। যারা ওই দিন শহিদ হন তাদের অনেকের পরিচয় জানা যায় নি। তবে তিন শহিদের নাম জানা যায় তারা হলেন– নাসির উদ্দিন, রোস্তম আলী ও নুর আলম। ভাগ্যক্রমে দু-একজন বেঁচেও যায়। কিছু শহিদের লাশ পড়ে ছিল যা ঘটনার পর পাকিস্তানি সেনারা চলে গেলে শাজাহান আলীসহ স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি লাশগুলো টেনে নিয়ে এসে গণকবর দেন।[১৮৮] ফুলবাড়ি বধ্যভূমিতে যাদের হত্যা করা হয় তাদের এখানে এলাকাবাসী গণকবর দেন। বালুদস্যুদের অপতৎপরতায় এ বধ্যভূমিটি এখন জলাভূমির চেহারা পেয়েছে। বালুদস্যুদের কারণে শহিদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদনের শেষ জায়গাটুকুও অবলুপ্ত প্রায়। ২০১০ সালের ৭ আগস্ট বধ্যভূমিটি সংস্কারের পর তৎকালীন বগুড়া মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ইউনিট কমান্ডার আমিনুল ইসলাম পিন্টু সেটির ফলক উন্মোচন করেন। এরপরেও স্থানটি অবহেলিত।[১৮৯]

আমতলা গণকবর

আমতলা গণকবর

চেলোপাড়া শান্তি নার্সারি গণকবরে নামফলক

২৪ এপ্রিল থেকে গ্রামের পর গ্রাম হানা দিতে শুরু করে পাকিস্তানি সৈন্যরা। চেলোপড়া, নড়িওলি, ইছাইদহ, আকাশতারা প্রভৃতি গ্রাম থেকে পাকিস্তানি বাহিনি বাঙালিদের ধরে আনে। এভাবে প্রায় ১৩০ জনকে শান্তি নার্সারীর নিকট জড়ো করে হত্যা করা হয়।[১৯০] বগুড়া সদরের চেলোপাড়া শান্তি নার্সারি গণকবর সম্পর্কে স্থানীয় লোকজন তেমন কিছু বলতে পারেনি। এলাকাটি মুক্তিযুদ্ধের সময় জনবহুল ছিল না। ওই সময়ের কোনো প্রত্যক্ষদর্শী না থাকার কারণে কেউ তেমন কিছু বলতে পারে নি।

চেলোপাড়া কুয়ো গণকবর

চেলোপাড়ায় একটি কুয়োয় সাধারণ মানুষদের হত্যা করে ফেলে দেওয়া হতো। সেজন্য একে চেলোপাড়া কুয়ো বধ্যভূমি বলা হয়। ২৪ এপ্রিলের চেলোপাড়া শান্তি নার্সারী গণহত্যার পর প্রায় প্রতিদিনই এই কুয়োয় মানুষ হত্যা করে ফেলে দেওয়া হতো। এ ধরনের চার-পাঁচটি বধ্যকূপ এখানে আছে।[১৯১]

চেলোপাড়া কুয়ো গণকবর

নারুলী গণকবর

১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর নারুলী, সাবগ্রাম, চেলোপাড়া, দত্তবাড়িসহ আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা জনতা নারুলী রেলগেটের কাছে জমায়েত হয়েছিল। তারা শহরের আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা ইসরাইল হোসেন বুলুর নেতৃত্বে শহরে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। স্থানীয় রাজাকাররা এ খবর পাকিস্তানি বাহিনিকে পৌঁছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি তাদের ঘিরে ফেলে এবং অতর্কিত গুলি চালাতে থাকে। ফলে, ২৩০ জনের বেশি মুক্তিযোদ্ধা সেখানেই শহিদ হন।[১৯২] মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে নারুলী গণকবরে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। শহিদগণ হলেন– ইসরাইল হোসেন বুলু, পিতা-মৃত কমরউদ্দিন নারুলী মধ্যপাড়া; শরীফ উদ্দিন প্রাং, পিতা-মৃত বুদা প্রাং, ঐ; বেলায়েত হোসেন, পিতা- অজ্ঞাত, ঐ; জসিম উদ্দিন, পিতা-অজ্ঞাত, ঐ; ছফের আলী শেখ, পিতা-অজ্ঞাত, ঐ; সরাফত আলী শেখ, পিতা-অজ্ঞাত, ঐ; আব্দুর রহিম, পিতা- অজ্ঞাত, চকআকাশ তারা; শরীফ, পিতা-অজ্ঞাত, চেলোপাড়া, বটতলা; বীরেন্দ্র নাথ দাস, পিতা-অজ্ঞাত, উত্তর চেলোপাড়া; গোপাহার আলী, পিতা-অজ্ঞাত, নারুলী; মেহেরাজ উদ্দিন, পিতা– মৃত বসির উদ্দিন, নারুলী[১৯৩]। স্বাধীনতার এতদিনেও এখানে কোন স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়নি।

নারুলী রেলগেট গণকবর

ভার্জিনিয়া টোব্যাকো মিল গণকবর

যুদ্ধ চলাকালীন বগুড়ায় ভার্জিনিয়া টোব্যাকো মিলে বাঙালি শ্রমিকসহ বাইরের অনেককেই হত্যা করে গণকবর দেয়া হয়েছে। গণহত্যার বর্ণনা দিয়ে মিল মসজিদের ইমাম ৮৫ বছর বয়সী মাজেদ আলী বলেন, মিলের সংখ্যাধিক্য বিহারি শ্রমিকরা স্বল্পসংখ্যক বাঙালি শ্রমিকদের মিলের বিভিন্ন মেশিন দিয়ে ও বয়লারে পুড়িয়ে হত্যা করে মিল চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় লাশ গুম করে ফেলে। গুম করা এ লাশের সংখ্যা প্রায় ১০০। এর মধ্যে মিলের শ্রমিক ৩৫-৪০ জন, বাকিরা বাইরের। মিল চত্বরে ৬-৭টি জায়গায় গণকবর রয়েছে। তবে গণকবরগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি।[১৯৪]

চকলোকমান গণকবর

মুক্তিযুদ্ধের সময় চকলোকমান এলাকার অন্তত ৭০ জন মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে গণকবর দেয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনি। দেশ স্বাধীনের পর ক্ষুদ্র পরিসরে গণকবর সংরক্ষণ করা হলেও বর্তমানে এর অবস্থা বেহাল। মুক্তিযুদ্ধে শহিদের স্মৃতিরক্ষায় গণকবরটি সংস্কার দরকার।[১৯৫]

বাগানবাড়ি তাল পুকুর গণকবর

বাগানবাড়ি তাল পুকুর এলাকায় বুলু জনতাকে নিয়ে পাকিস্তান বিরোধী মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের সাতমাথার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মিছিলটি ঠেকানোর জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি নির্বিচারে গুলি করে। বুলুসহ এলাকার অনেক মানুষ শহিদ হন। স্বাধীনতার পরেই এ গণকবরটি চিহ্নিত করলেও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে গণকবরের জায়গাটি এখন বেদখল।[১৯৬]

মালতীনগর গণকবর

বগুড়ার শহরের মালতিনগর এলাকা মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেককে গণকবর দেওয়া হয়। রহমান নগর, কলোণী, মাটিরঘর বিভিন্ন এলাকার লোকজনকে হত্যা করে এখানে এনে গণকবর দেওয়া হতো বলে জানা যায়।[১৯৭]

উপর্যুক্ত গণকবরগুলো ছাড়া শহরদীঘি গণকবর, সাবগ্রাম গণকবরের কথা জানা যায়।[১৯৮]

ধুনট উপজেলা

ভরনশাহী গ্রাম গণকবর

ধুনট থানা ভবনের ২০০ গজ দুরে রাস্তার পাশে পশ্চিম ভরনশাহী গ্রামে দুটি গণকবর আছে। সেই গণকবরের দেওয়ালে খোদাই করে ১৪ জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার নাম লেখা হয়েছে।[১৯৯] এই গণকবরে যাদের মৃতদেহ রাখা হয়েছে তারা হলেন– ভরনশাহী গ্রামের জহির উদ্দিন, কান্তগর গ্রামের মোস্তাফিজুর রহমান, মাজবাড়ি গ্রামের একই পরিবারের দুই ভাই জিল্লুর রহমান, ফরহাদ আলী ও পর্বত আলী, চাঁন্দারপাড়া গ্রামের আব্দুল লতিফ, শিয়ালী গ্রামের নরুল ইসলাম।[২০০] সেখানে ভরনশাহী গ্রামের এক ব্যবসায়ি চাল কল ও গুদামঘর নির্মাণ করে গণকবরটি ঘেরাও করে রেখেছে। যা দূর থেকে চেনার কোন উপায় নেই। একটি গণকবর সংস্কারের অভাবে অরক্ষিত হয়ে পড়ে আছে। আর একটি গণকবর পাকা করা হয়েছে।[২০১]

ভরনশাহী গ্রাম গণকবর

দুপচাঁচিয়া উপজেলা

দুপচাঁচিয়া কুণ্ডুপাড়ার চৌধুরি বাড়ির পুকুরপাড় গণকবর

১১ এপ্রিল ১৯৭১।[২০২] বগুড়া শহর থেকে ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে দুপচাঁচিয়া থানা সদরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি গণহত্যা শুরু করে। লুণ্ঠন, ধর্ষণ আর গণহত্যার বীভৎসতায় পাকিস্তানি হায়েনাদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার ও তাদের দোসররা। সেদিন তাদের হাতে প্রাণ হারায় নাম না জানা অসংখ্য নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষ। এর আগে রাজাকারদের নেতৃত্বে কয়েকটি মন্দিরের স্বর্ণালংকার, কাঁসার তৈজসপত্র, অর্থকড়িসহ সবকিছু লুটপাট করা হয়। আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় স্থানীয় রাজনীতিবিদ ডা. আনোয়ার হোসেনের ওষুধের দোকান ও আশেপাশের ঘরবাড়িতে। ওইদিনই রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্থানি হানাদার বাহিনি গণহত্যা চালায় দুপচাঁচিয়া চৌধুরীপাড়ার ঐতিহ্যবাহী চৌধুরী বাড়িতে।[২০৩]

মন্মথ চন্দ্র কুণ্ডু ও তার পরিবারের ৮-৯ জন সদস্যসহ বগুড়া শহর থেকে দুপচাঁচিয়া হয়ে জয়পুরহাট দিয়ে ভারতে যাবার জন্য রওনা হয়। ভারত যাওয়ার পথে তারা রাতে দুপচাঁচিয়ার কুণ্ডুপাড়ার ক্ষিতিশ চন্দ্র চৌধুরি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। স্থানীয় অবাঙালিরা সেই খবর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির কাছে পৌঁছে দেয়। পাকিস্তানি বাহিনি ওই রাতে জমিদার বাড়িতে আক্রমণ করে। ওই বাড়িতে সবাইকে পুকুরপাড়ে একত্র করে নারীদের ওপর নির্যাতন করে এবং সবাইকে হত্যা করে।[২০৪]

সেদিনের সেই নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হন– যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ওরফে ক্ষিতীশ চৌধুরী, মন্মথ কুণ্ডু, দূর্গা কুণ্ডু, কালাচাঁদ কুণ্ডু, সন্তোষ কুণ্ডু, কানাইলাল পোদ্দার, ব্রজমোহন সাহা, পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু কাকলীসহ আরও কয়েকজন। ইউনিয়ন পরিষদের দফাদার তহিরউদ্দিন শাহ, ওষুধ ব্যবসায়ী সতীশ চন্দ্র বসাক, শরৎ মজুমদার, অক্ষয় কুণ্ডুসহ তৎকালীন মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের ম্যানেজারের পরিবারের সদস্যরা।[২০৫]

নিষ্ঠুর, নির্মম পাকিস্তানি বাহিনির হাত থেকে রক্ষা পায়নি পাঁচ বছরের অবুঝ শিশুও। পাকিস্তান হানাদার বাহিনি বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়েছিল পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু কাকলীর বুকে। তারপর ফুটফুটে শিশু কাকলীকে আছড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল সিঁড়ির উপর! ছোট্ট শরীরের রক্তে ভিজে গিয়েছিল বগুড়ার দুপচাঁচিয়া চৌধুরীবাড়ির সিঁড়ি আর মেঝে। অবশেষে ছোপ ছোপ রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল কাকলীর অবুঝ প্রাণ, থেমে গিয়েছিল শেষ ক্রন্দনরোল।[২০৬]

গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ভান করে পড়ে থাকেন শুধু মন্মথ কুণ্ডুর মেয়ে তৃপ্তি রাণী। পরিবার-পরিজনসহ নয়জনকে সেদিন হারিয়ে তৃপ্তি ভাগ্যবশত প্রাণে বেঁচে গেলেও পরবর্তীকালে তাঁকে জীবিত অবস্থায় কাটাতে হয় মৃত্যুর অনুভূতিময় বীভৎস জীবন। পাকিস্তানি হায়না থেকে শুরু করে রাজাকার দোসরদের কাছে তৃপ্তিকে হতে হয়েছিল গণধর্ষিত! হানাদার বাহিনি বেরিয়ে যাওয়ার সময় একটানা গোলাগুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় মন্দিরের ফটক, চৌধুরী বাড়ির প্রবেশদ্বার। বুলেটবিদ্ধ করা হয় চৌধুরীবাড়ির ফটকে শোভিত স্বনামধন্য ভাস্কর নলিনীমোহন কুণ্ডুর হাতে গড়া কারুকার্যপূর্ণ বিভিন্ন ভাস্কর্য।

নিথর অবস্থায় পড়ে থাকা লাশগুলোর সদগতি হয়নি পরদিনও। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দূরে থাক, হানাদার বাহিনির ভয়ে নিজ মাতৃভূমিতে কবর খুঁড়ে চিরদিনের জন্য একটু শান্তিতে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দেওয়ারও কেউ ছিল না সেদিন! দুদিন পর এ হত্যাযজ্ঞের খবর পেয়ে ছুটে আসেন নিমাইসুন্দর চৌধুরী, অনন্তমোহন কুণ্ডু, বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও জয়ন্ত কুণ্ডু। শোকে স্তম্ভিত হন তাঁরা। অন্য উপায় না পেয়ে নিজের হাতে তাঁদের জন্য গণকবর খুঁড়ে লাশগুলো সমাধিস্থ করেন চৌধুরীবাড়ির শ্যাম সরোবরের সন্নিকটে।[২০৭]

স্বাধীনতার পর সেই বধ্যভূমিটি ইটের দেয়াল দিয়ে অস্থায়ীভাবে ঘিরে রেখেছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামী অনন্ত মোহন কুণ্ডু, নিমাইসুন্দর চৌধুরী ও জয়ন্ত কুণ্ডুসহ আরও অনেকে। কিন্তু কালের গর্ভে প্রাকৃতিক অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝায় তা হারিয়ে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের একচল্লিশ বছর পরে দুপচাঁচিয়ার এই বধ্যভূমিটি উপজেলা প্রশাসন ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উদ্যোগে সাময়িক সংস্কার করা হয়েছে। শহিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেখানে নামফলকও নির্মাণ করা হয়েছে।[২০৮]

দুপচাঁচিয়া কুণ্ডুপাড়ার চৌধুরি বাড়ির পুকুরপাড়

তালোড়া আলতাফ আলী হাইস্কুল মাঠ দক্ষিণ-গণকবর

দুপচাঁচিয়া হাই স্কুল ও থানায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির সদস্যরা প্রথমে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে। এছাড়া রাজাকাররাও তাদের বাড়িতে স্থানীয় লোকদের নিয়ে এসে নির্যাতন করতো। পরে তালোড়া আলতাফ আলী হাইস্কুলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির একটি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন হয়। পাকিস্তানি বাহিনি এই ক্যাম্প বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ মানুষজনকে ধরে আনত এবং তাদের হত্যা করত। হাইস্কুলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পুকুরপাড়ের তালতলায় পাকিস্তানি বাহিনি সাধারণ মানুষকে হত্যা করে গণকবর দেয়।[২০৯]

তালোড়া আলতাফ আলী হাইস্কুলের মাঠে গণকবর

দুপচাঁচিয়া পৌর গোরস্থান গণকবর

দুপচাঁচিয়া হাই স্কুলের পিছনে পৌর গোরস্থান অবস্থিত। এই গোরস্থানে ১৯৭১ সালের শহিদের সমাধি রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কতজন শহিদের লাশ এখানে পুঁতে রাখা হয় তা জানা যায় নি। তবে, প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কিছু দিন পরপরই এখানে জন সাধারণদের হত্যা করে লাশ পুঁতে রাখা হতো।

পৌর গোরস্থান

গাবতলী উপজেলা

নতুনপাড়া গণকবর

গাবতলী উপজেলার সুখানপুকুর রেল লাইনের ধারে নতুনপাড়ায় গণকবর রয়েছে। রেল লাইনের পাশে একসঙ্গে ১৭ জনকে হত্যা করা হয়। হত্যার পর পাকিস্তানি বাহিনি লাশগুলো ফেলে রেখে চলে যায়। এরপর স্থানীয় অধিবাসীগণ ওই লাশগুলো মাটিচাপা দেয়।[২১০]

সুখানপুকুর রেল লাইন

কাগইল জমিদারবাড়ি গণকবর

গাবতলী উপজেলার কাগইল ইউনিয়নের জমিদারবাড়িতে পাকিস্তানি সেনারা ১২ জনকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। এরা সবাই তৎক্ষণিকভাবে শহিদ হন। নিহতদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু ধর্মের। পাকিস্তানি বাহিনি চলে গেলে এলাকার মানুষজন তাদের কবর দেয়।[২১১]

কাগইল জমিদারবাড়ি

কাহালু উপজেলা

নশিরপাড়া গণকবর

কাহালুর নশিরপাড়ায় পাকিস্তানি বাহিনি গণহত্যা চালিয়ে চলে যাওয়ার পর শহিদের লাশগুলোকে আত্মীয়-স্বজনরা ও গ্রামবাসী তাদেরকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করেন। তবে শহিদের কবরগুলো সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত নেয়া হয়নি।

জয়তুল গ্রাম গণকবর

জয়তুল গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনি গণহত্যা চালিয়ে চলে যাওয়ার পর শহিদের লাশগুলোকে আত্মীয় স্বজনরা ও গ্রামবাসী তাদেরকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করেন।

শিবগঞ্জ উপজেলা

মজুমদারপাড়া গণকবর

শিবগঞ্জ উপজেলার ময়দানহাটা ইউনিয়নের একটি গ্রাম মজুমদারপাড়া। ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল মজুমদারপাড়ায় গণহত্যা

শিকারদের কাচারি ঘরের পাশে ধানের জমিতে এবং নিশির বাড়ির খুলিতে পুঁতে রাখা হয়।[২১২]

মজুমদারপাড়া গণকবর

শেরপুর উপজেলা

শেরপুরের কল্যাণী গণকবর

কল্যাণী গণকবরটি শেরপুর উপজেলার সুঘাট ইউনিয়নে অবস্থিত। ১৯৭১ সালের মে মাসের প্রথম শুক্রবার রাজাকার, আলবদরদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি কল্যাণী গ্রামটিকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলে লুটপাট, নির্যাতন ও গণহত্যা চালায়। কল্যাণী গ্রামের বেশির ভাগ অধিবাসী হিন্দু ছিল। সেদিন পাকিস্তানি সেনারা যাকে যেখানে পেয়েছে, সেখানেই গুলি করে হত্যা করেছে। একই সঙ্গে বাড়িঘরে লুটপাট চালিয়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় তারা। সেদিন হানাদার বাহিনির গুলিতে নিহত অনেকেরই নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে তারা হলেন– কল্যাণী গ্রামের ১. বীরেন্দ্রনাথ পাল, ২. জোগেস্বর পাল, ৩. ধলু/ঢলু পাল, ৪. মতিলাল পাল, ৫. হারান পাল, ৬. সুদেব পাল, ৭. রাজেন পালন, ৮. লাল বিহারী পাল ৯. চিত্ত পাল, ১০. কৃষ্ণ পাল, ১১. ক্ষুদিরাম পাল ১২. রাধিকা পাল, ১৩. নরেন্দ্র মহন্ত ১৪. বাদল পাল, ১৫. মনিন্দ্র নাথ পাল, ১৬. নারায়ন পাল, ১৭. মনিন্দ্রনাথ প্রকৌশলী, ১৮. পুষ্প পাল, ১৯. নেংড়া পাল, ২০. শ্রীবাস শীল প্রমুখ।[২১৩] এছাড়া *দৈনিক বণিক বার্তায়*

বেশ কয়েকজন শহিদের নাম পাওয়া যায় । তারা হলেন– ফুরিয়া পাল, শ্রীদীপ পাল, ন্যাড়া পাল, বিহারী পাল ।[২১৪]

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে শহিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিশিষ্ট সাংবাদিক মুন্সী সাইফুল বারী ডাবলুর প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে কল্যাণী গণকবরটি চিহ্নিত করে সেখানে একটি শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধে শহিদের স্মরণে নির্মিত বগুড়ার শেরপুর উপজেলার কল্যাণী গণকবর । মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটি সংরক্ষণের জন্য নিরাপত্তা প্রাচীরসহ স্মৃতিস্তম্ভটি পুনর্নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা ।[২১৫]

শেরপুরের কল্যাণী গণহত্যায় শহিদদের স্মৃতিস্তম্ভ

সোনাতলা উপজেলা

সোনাতলার পি. টি. আই মোড় গণকবর

সোনাতলার পি. টি. আই মোড়ে পাকিস্তানি বাহিনির একটি ক্যাম্প ছিল । এই ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস উপজেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে জনসাধারণকে ধরে নিয়ে এসে নির্যাতন করে হত্যা করত । তাদেরকে বটতলায় এক সঙ্গে গণকবর দেওয়া হয় ।[২১৬]

সোনাতলার পি. টি. আই মোড়

রেলওয়ে স্টেশনে পেছনে গোডাউনের পাশে গণকবর

সোনাতলা রেলওয়ে স্টেশনে পেছনে গোডাউনের পাশে একটি গণকবর আছে। কতজনকে এখানে গণকবর দেওয়া হয়েছে তার পরিসংখ্যান কেউ দিতে পারেনি। গোডাউনের স্থানে সোনাতলা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। সেখানে কোন গণহত্যার শিকারদের নামে কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মণা করা হয় নি ।

এছাড়াও সোনাতলার হারিয়াকান্দিতে একটি গণকবরের কথা জানা যায় ।[২১৭]

রেলওয়ে স্টেশনে পেছনে গোডাউনের পাশে গণকবর

নির্যাতন কেন্দ্র
বগুড়া সদর উপজেলা

বগুড়া সদরে পাকিস্তানি বাহিনির ক্যাম্পসমূহ

প্রথম দফায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি বগুড়া শহর দখলের সময় প্রতিরোধ যুদ্ধে পরাজিত হলেও এরপর তিনদিক থেকে বগুড়ায় আক্রমণ করে বগুড়া দখল করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি বগুড়া শহর দখলের পরপরই অনেকগুলো ক্যাম্প স্থাপন করে। এরপর এই ক্যাম্পগুলো থেকে শুরু হয় অভিযান। বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিরীহ নারী-পুরুষ ও শিশুদের উপর চালায় অকথ্য নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ।

সার্কিট হাউজ ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

বগুড়া সার্কিট হাউজে পাকিস্তানি বাহিনির ক্যাম্প ছিল। ওই সময় সার্কিট হাউজ পাকিস্তানি বাহিনির টর্চার সেল হিসেবে পরিচিত ছিল। নিরীহ বাঙালিদের ধরে এনে এখানে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হতো।[২১৮]

সার্কিট হাউজ

সরকারি আজিজুল হক কলেজ পুরাতন ভবন ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

আজিজুল হক কলেজের পুরাতন ভবনে পাকিস্তানি বাহিনির একটি ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটেলিয়ান ১৩-এর প্রধান ক্যাম্প স্থাপন করে।[২১৯] এই ক্যাম্পে যাদের ধরে নিয়ে আসা হতো তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন করে আমতলা করতোয়া নদীর তীরে নিয়ে হত্যা করা হতো। তাদের লাশ পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো।[২২০] এছাড়া এই ক্যাম্পে পাকিস্তানি বাহিনি মোঃ মমতাজুর রহমান নামে একজন কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা করে।[২২১] ১৪ ডিসেম্বর যৌথ বাহিনির আক্রমণের আজিজুল হক কলেজ ক্যাম্প ছেড়ে যায়।[২২২] প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য মতে, পাকিস্তানি বাহিনি এই ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়া পর তারা এখানে শতাধিক লাশ পড়ে থাকতে দেখেছেন। এবং কলেজ মাঠের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় মাটি খনন অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন। তাদের ধারণা এই স্থানগুলোতে অনেক মানুষকে হত্যা করে পুঁতে রাখা হয়েছে।[২২৩] পাকিস্তানি বাহিনি চলে যাওয়ার সময় কলেজের প্রচুর তথ্য, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ধ্বংস করে।[২২৪]

সরকারি আজিজুল হক কলেজ নতুন ভবন ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

সরকারি আজিজুল হক কলেজ নতুন ভবনে পাকিস্তানি বাহিনির ক্যাম্প ছিল। যেখানে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন করে হত্যা করা হতো। কলেজ থেকে বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করে নিরীহ মানুষদের হত্যা করা হতো। কলেজের পশ্চিম দিকে ঠিক সমানেই ছিল জামিলে গোডাউন। এখান থেকে সেউজগাড়ি, কাটনারপাড়া, চকসূত্রাপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ করে মানুষজনকে হত্যা করা হয়।[২২৫]

সুবিলের সিঅ্যান্ডবি রেস্টহাউস ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

সুবিলের সিঅ্যান্ডবি রেস্টহাউসে পাকিস্তানি বাহিনির একটি ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্প স্থাপনের পূর্বেই মাটিডালী, বৃন্দাবনপাড়া এবং ফুলবাড়ি গ্রামের কিছু কিছু বাড়ি তারা আগুন জ্বালিয়ে দেয়।[২২৬] এরপর এই ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানি বাহিনি সাধারণ মানুষকে ধরে রেখে নির্যাতন করত। প্রতিদিনই পাকিস্তানি বাহিনি এই ক্যাম্প থেকে

বের হয়ে শহরের মধ্যে লুট ও হত্যাকাণ্ড সংঘটন করত।[২২৭] ১৪ ডিসেম্বর যৌথবাহিনি আক্রমণের মুখে সুবিল রেস্টহাউস ছেড়ে চলে যায় পাকিস্তানি সেনারা।[২২৮]

পুলিশ লাইনস ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

বগুড়া শেরপুর রোডে পুলিশ লাইনস ক্যাম্প[২২৯] ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের অন্যতম শক্ত ঘাটি। পাকিস্তানি বগুড়া শহর দখল করে প্রথমেই পুলিশ লাইনে থাকা বাঙালিদের হত্যা করে। এরপর মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এখান থেকে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। ঠনঠনিয়া, লিচুতলা, মালতিনগর, বক্সিবাজার এলাকায় অভিযান চালায়।

জিলা স্কুল ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

বগুড়া জিলা স্কুলে পাকিস্তানি বাহিনির একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি অভিযান চালিয়ে অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ ও গণহত্যা সংঘটন করে।[২৩০] এই ক্যাম্পে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরীহ মানুষজনকে ধরে এনে নির্যাতন ও হত্যা করে। এ দিন যৌথ বাহিনি কাছে পাকিস্তানি বাহিনি আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে বগুড়া জিলা স্কুলে ওড়ানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।[২৩১]

মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

সরকারি আজিজুল হক কলেজ পুরাতন ভবন ও মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ পাশাপাশি অবস্থিত। পাকিস্তানি বাহিনি দুটো কলেজকেই তাদের ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে। এই সেনা ক্যাম্প থেকে পাকিস্তানি বাহিনি বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, হাট-বাজার ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অপরাধ মূলক কর্ম সংঘটন করে।[২৩২] ১৪ ডিসেম্বর যৌথ বাহিনির আক্রমণের মুখে মহিলা কলেজ ছেড়ে যায় পাকিস্তানি সৈন্যরা।[২৩৩]

ভার্জিনিয়া টোবাকো মিল ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

যুদ্ধ চলাকালীন বগুড়ায় ভার্জিনিয়া টোব্যাকো মিলে পাকিস্তানি বাহিনি ক্যাম্প গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস একই ক্যাম্পে

পাকিস্তানি বাহিনি মিলের বাঙালি শ্রমিকদের বন্দি করে রাখে এবং তাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করে। শ্রমিক ছাড়াও বাইরে সাধারণ মানুষকে ধরে এনে পাকিস্তনি বাহিনি নির্যাতন করত। অবাঙালি বিহারিরা ও স্থানীয় রাজাকাররা পাকিস্তানি সৈন্যদের মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী লীগের কর্মী ও হিন্দুদের সম্পর্কে অনুসন্ধান দিতো। ফলে তাদের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অভিযান চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে আনতো এবং নির্মম অত্যাচার করে হত্যা করতো।[২৩৪]

কটন মিল রেষ্ট হাউজ ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

কটন মিল রেষ্ট হাউজে পাকিস্তানি বাহিনির একটি বড় ক্যাম্প ছিল। এখানে পাকিস্তানি বাহিনি মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। ১৪ ডিসেম্বর যৌথ বাহিনি বগুড়া শহরে আক্রমণ শুরু করলে তাদের আক্রমণের মুখে সুবিল রেস্টহাউস, আজিজুল হক ও মহিলা কলেজ ক্যাম্প ছেড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা কটনমিল ক্যাম্পে অবস্থান নেয়। এরপর পাকিস্তানি সৈন্যরা যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমার্পণ করে।[২৩৫]

বগুড়া অটোজ সেনা ক্যাম্প

বগুড়া অটোজে পাকিস্তানিদের একটি সেনা ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পে নারী ধর্ষণ ও অনেক সাধারণ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়। তবে কতজনকে এই ক্যাম্পে হত্যা করা হয় তার পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।[২৩৬]

বগুড়া মূক ও বধির বিদ্যালয় সেনা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

বগুড়া মূক ও বধির বিদ্যালয়ে পাকিস্তানি বাহিনির একটি সেনা ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনি অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ ও গণহত্যা সংঘটিত করে।[২৩৭]

ধুনট উপজেলা

ধুনট থানা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

১৯৭১ সনের ৭ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনি ধুনট থানা প্রবেশ করে। এরপর থানায় পাকিস্তানি বাহিনি সেনাক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্প

থেকে পাকিস্তানি বাহিনি নয় মাস পুরো উপজেলায় নির্যাতন ও গণহত্যা সংঘটিত করে। তবে, প্রতিটি ইউনিয়নে তাদের সহযোগী রাজাকারদের নেতৃত্বে সাব ক্যাম্প ছিল।[২৩৮]

দুপচাঁচিয়া উপজেলা

দুপচাঁচিয়া থানা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের ১০ সন্ধ্যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি সান্তাহার থেকে দুপচাঁচিয়ায় প্রথম প্রবেশ করে। তারা দুপচাঁচিয়া প্রবেশ করে ওই রাতে থানা অবস্থান নেন। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দুপচাঁচিয়া এটিই ছিল পাকিস্তানি বাহিনির প্রধান ক্যাম্প। এই ক্যাম্প থেকে উপজেলার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

দুপচাঁচিয়া হাইস্কুল ক্যাম্প

দুপচাঁচিয়া প্রবেশ করে থানার পর হাইস্কুলে পাকিস্তানি বাহিনি ক্যাম্প স্থাপন করে। পরের দিনে হাইস্কুলের নিকটে কাঠের সেতু সংলগ্ন এলাকায় হিন্দু কাপড় ব্যবসায়ী সতীশ চন্দ্র বসাকের দোকানে হামলা করে তাকে মেরে ফেলে। এর পর থেকে পরবর্তী নয় মাস পাকিস্তানি বাহিনি অবাঙালি ও রাজাকারদের সহযোগিতায় প্রতিদিন বিভিন্ন বাড়িতে হামলা করে মানুষ হত্যা, বাড়ি-ঘর লুটপাট করে ও নারীদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

তালোড়া বন্দর ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

বগুড়ার তালোড়া বন্দরে ছিল পাকিস্তানিদের শক্তিশালী ঘাঁটি। এই বন্দর এলাকায় ফলবাগান পুকুর, দুর্গাদহের পদ্মপুকুর, তালোড়া স্কুল প্রভৃতি স্থানে বাঙালিদের ধরে এনে নির্যাতনের পর হত্যা করা হতো। তালোর পদ্মপুকুরে পিতাপুত্র সহ ১৪ জনকে একরাতেই হত্যা করা হয়। আদমদীঘি, নশরতপুর, চামরুল প্রভৃতি এলাকা থেকে বাঙালিদের ধরে এনে তালোড়ায় হত্যা করা হতো।[২৩৯]

তালোড়া বন্দর

গাবতলী উপজেলা

গাবতলী উপজেলা পরিষদে পাকিস্তানি নির্যাতন কেন্দ্র

গাবতলী উপজেলা পরিষদের পাকিস্তানি বাহিনির একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্প পাকিস্তানি সেনারা নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার করত। পাকিস্তানি বাহিনি এই ক্যাম্পে যাদের নির্যাতন করে হত্যা করে তাদের মধ্যে রয়েছে– মমতাজ উদ্দিন (তরফ সরতরাজ), ডা. ওমীয় কুমার, (জয়ভোগা), আব্দুল ওয়াহাব, (জয়ভোগা), লাল মিয়া, (উনচুরকি), দিনবন্ধু রাজভার, মন্তেজার রহমানসহ আরও অনেককে।[২৪০]

গাবতলী উপজেলা পরিষদ

গাবতলী উপজেলা সিও অফিস ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

গাবতলী থানায় ২৭ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা সিও অফিসে ক্যাম্প স্থাপন করে। মুসলিম লীগ ও কিছু দালালদের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ হত্যা ও বাড়ি ঘরে আগুন দিতে থাকে।

কাহালু উপজেলা

মুরইল ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

পাকিস্তানি বাহিনি বগুড়া গোদারপাড়া হয়ে কাহালু মুরইল মাদ্রাসায় পৌঁছায় এবং সেখানে একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। এরপর এই ক্যাম্পে আশেপাশের অঞ্চল থেকে সাধারণ মানুষকে ধরে এনে নির্যাতন ও হত্যা করা হতো।

কাহালু রেলওয়ে স্টেশন ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

পাকিস্তানি বাহিনির একটি দল সান্তাহার থেকে রেল যোগে কাহালু রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছায় এবং সেখানে তারা একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্প থেকে আক্রমণ করে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ব্যাপকভাবে গণহত্যা সংঘটিত করে।

কাহালু থানা ভবন ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

কাহালু রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাম্প স্থাপনের পর পাকিস্তানি সৈন্যরা থানা ভবনেও ক্যাম্প স্থাপন করেন। এই ক্যাম্পটি শ্রী-বালাজী রাইস মিল ক্যাম্প নামেও পরিচিত। এই ক্যাম্প বহু নারীকে ধরে এনে ধর্ষণ করা হয়। অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়।

নন্দীগ্রাম উপজেলা

নন্দীগ্রাম থানা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

১৯৭১ সালে ৭ এপ্রিল নন্দীগ্রাম উপজেলায় পাকিস্তানি বাহিনি প্রবেশ শুরু করে এবং থানায় তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। এরপর পাকিস্তানি বাহিনি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামে অভিযান করে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও মানুষ হত্যা করে। তারা ক্যাম্পে নিয়ে এসে নারীদের উপর্যুপরি ধর্ষণ করত এবং পুরুষদের ওপর শারীরিক অত্যাচার শেষে নির্মমভাবে হত্যা করত।

রণবাঘা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

রণবাঘায় পাকিস্তানি বাহিনির একটি ক্যাম্প ছিল। যেখানে সাধারণ মানুষকে ধরে বন্দি রাখা হতো। তাদের ওপর চালানো হতো নির্মম নির্যাতন। ক্যাম্পে যাদের বন্দি রাখা হতো তাদের বেশির ভাগকে পরে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাদের ক্যাম্পের পাশেই পুঁতে রাখা হয়।

মনসুর হোসেন ডিগ্রী কলেজ ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

মনসুর হোসেন ডিগ্রী কলেজ ক্যাম্পে বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষজনকে ধরে এনে হত্যা করা হতো। মাঠের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনি হত্যাকৃতদের লাশ পুঁতে রাখে।

শাজাহানপুর উপজেলা

আড়িয়াবাজার ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

এপ্রিলের ১ বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের ক্যান্টনমেন্টের কাছে আড়িয়াবাজারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি ক্যাম্প স্থাপন করেছিল।[২৪১] এই ক্যাম্পে সাধারণ জনসাধারণ আক্রমণ করে। এই আক্রমণে শহিদ হন– মাসুদ আহমেদ। এরপর পাকিস্তানি সেনা আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়

এবং প্রতিদিনই কোনো না কোনো গ্রামে আক্রমণ করে সাধারণ মানুষকে হত্যা করত। এর সবথেকে বড় প্রমাণ আড়িয়াবাজার পালপাড়ায় পাকিস্তানি বাহিনি আক্রমণ করে পুরো পাড়া অগ্নিসংযোগ করে পুড়ে দেয় এবং এলোপাথারি গুলি চালিয়ে অনেকে হত্যা করে।

খোট্টাপাড়া মাদ্রাসা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

খোট্টাপাড়া মাদ্রাসায় পাকিস্তানি বাহিনির ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্প থেকে তারা রাজাকারদের সহযোগিতায় বিভিন্ন গ্রামে আক্রমণ করে লুটতরাজ, নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাতো। মাঝিড়া গ্রামের দশম শ্রেণির ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে হত্যা করে।

ডেমাজানি হাইস্কুল অস্থায়ী ক্যাম্প

রাজাকারদের সহযোগীরা ডেমাজানি হিন্দুপাড়া ও শাহপাড়ার সব হিন্দুদের ধরে এনে ডেমাজানি হাইস্কুল মাঠে আনে। সেখানে তাদের কালেমা পড়ে মুসলমান করা হয়। ডেমাজানি গ্রামের মছিরউদ্দিনকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। ডেমাজানিতে চেয়ারম্যান রাজিবুল ইসলামের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট চালানো হয়, মাদলা চাঁচাইতারা জমিদারবাড়ি, দত্তবাড়িসহ আশেপাশের গ্রামে লুণ্ঠন, আর হামলা চালানো হয়।

মাদলা ইউনিয়ন পরিষদ ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

মাদলা ইউনিয়ন পরিষদে পাকিস্তানি বাহিনির একটা ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্প থেকে অভিযান চালিয়ে তারা সাধারণ মানুষ ধরে নিয়ে এসে নির্মমভাবে নির্যাতন করে হত্যা করত।

নুরুল আল নুর মাদ্রাসা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

নুরুল আল নুর মাদ্রাসায় পাকিস্তানি বাহিনির একটি ক্যাম্প ছিল। যেখানে অনেক মানুষকে বন্দি করে তাদের ওপর নির্যাতন করা হয় এবং নির্যাতন শেষে তাদের হত্যা করা হয়।

শেরপুর উপজেলা

শেরপুর থানা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির সদস্যরা শেরপুর থানায় তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। এ ক্যাম্পে ১০ থেকে ১৫ জন করে হানাদার

বাহিনির সদস্য থাকতো। সর্বোচ্চ সুবেদার র‍্যাংকের (পদের) একজন কর্মকর্তা ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন। বিশেষ বিশেষ সময়ে জেলা থেকে মেজর বা স্থানীয় শীর্ষ কোনো কর্মকর্তা আসতেন। তারা কিছুসময় থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে চলে যেতেন। এছাড়া উপজেলার প্রায় সবগুলো ইউনিয়নে পাকিস্তানি বাহিনি তাদের সহযোগী রাজাকারদের জন্য একটি করে ক্যাম্প ছিল।

শেরপুর কলেজ ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

পাকিস্তানি সৈন্যরা শেরপুরে প্রবেশ করে কলেজে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কলেজের বিজ্ঞানাগারের মূল্যবান বইপত্র ও বিজ্ঞান বিষয়ক সরঞ্জামাদি রাখা ঘরটি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এরপর কলেজে তাদের একটি ক্যাম্প গড়ে তোলে। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি অনেক সাধারণ মানুষকে এই ক্যাম্প থেকে আক্রমণে করে হত্যা করে।

শিবগঞ্জ উপজেলা

মহাস্থানগড় ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

মহাস্থানগড়ে ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির ক্যাম্প।[২৪২] এই ক্যাম্প থেকে মহাস্থান ব্রিজের পাশে একটি চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়। যেখানে পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রত্যেকটি গাড়িতে চেক করত। যাদের সন্দেহ হতো তাদেরকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হতো। তাদের বেশির ভাগকে হত্যা করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টার দিকে বগুড়া অভিমুখে রওনা হয় মিত্র বাহিনি। সেখানে পাকিস্তানি সেনারা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলে সম্মুখযুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে মিত্রবাহিনির চারজন সৈনিক মারা যান। আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সৈন্য পিছু হটতে বাধ্য হয়।

মোকামতলা ডাকবাংলো ক্যাম্প

মোকামতলা ডাকবাংলোতে পাকিস্তানি বাহিনির একটি ক্যাম্প ছিল।[২৪৩] এই ক্যাম্পে পাকিস্তানি বাহিনি শংকরপুর, চাকলমা, কাশিপুর, নওয়ানা, মুরাদপুর, মালাহার, আমজানি, গনেশপুরসহ বিভিন্ন

এলাকা থেকে রাজাকারদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের সমার্থকদের ধরে নিয়ে এসে তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার পরিচালনা করত। এই ক্যাম্পে অত্যাচার শেষে চৌকিরঘাটে তাদের নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হতো।[২৪৪]

মোকামতলা ডাকবাংলো

সিও অফিস ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি প্রথম শিবগঞ্জে প্রবেশ করে। এরপর সাবেক সিও অফিস বর্তমানে উপজেলা পরিষদের উত্তরে বিএডিসি অফিসে ক্যাম্প স্থাপন করে। সেখান বিভিন্ন এলাকার মুক্তি পাগল মানুষকে ধরে এনে তাদের ওপর চালাতো হতো নির্মম নির্যাতন।

শিবগঞ্জ থানা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

পাকিস্তানি বাহিনি শিবগঞ্জ থানাতেও তাদের একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্পে সাধারণ মানুষকে ধরে এনে নির্যাতন শেষে হত্যা করা হতো।

আদমদীঘি উপজেলা

সড়ক ও জনপথ বিভাগের কারখানা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনি রাণীনগর স্টেশন হয়ে সান্তাহার জংশন স্টেশনে প্রবেশ করে। পাকিস্তানি বাহিনি সান্তাহার শহরের সড়ক ও জনপথ বিভাগের যান্ত্রিক কারখানায় একটি বৃহৎ ক্যাম্প স্থাপন করে। এখান থেকে পাকিস্তানি বাহিনি পরবর্তী নয় মাস পুরো উপজেলায় গণহত্যা সংঘটন করে।

আদমদীঘি থানা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

আদমদীঘি থানা পাকিস্তানি বাহিনির আরও একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পে অনেক রিজার্ভ সৈন্য থাকতো যেখান থেকে রেলপথে বিভিন্ন জায়গায় সৈন্য প্রেরণ করা হতো।

সারিয়াকান্দি উপজেলা

সারিয়াকান্দি থানা ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি সারিয়াকান্দিতে প্রবেশ করে থানায় ক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্পকে বন্দিশিবির ও নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতো।

সোনাতলা উপজেলা

সোনাতলা পি.টি.আই ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

সোনাতলায় প্রবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনি পি.টি.আই-এ ক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্প থেকে ঘোরাপীরের বাজার, রেলস্টেশন, বাইগুনী, রাণীরহাট বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা সংঘটিত করা হয়।

সুখানপুকুর ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র

সুখানপুকুর পাকিস্তানি বাহিনির একটি ছোট ক্যাম্প ছিল। এখান থেকে বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালিয়ে অনেক মানুষকে তারা হত্যা করে।

ভেলুরপাড়া ক্যাম্প

ভেলুরপাড়া পাকিস্তানি বাহিনির একটি অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল। এখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষজনকে ধরে এনে গুলি করে হত্যা করা হতো।

শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর
বগুড়া সদর উপজেলা

শহিদ তোতা মিয়া

বগুড়া দখল নেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি বাহিনি বার বার চেষ্টা করে।[২৪৫] ২৬ মার্চ সকালের রংপুর থেকে পাকিস্তানি সৈন্যের একটা বহর বগুড়া শহরের অভিমুখে রওনা হয়ে বাঘোপাড়া এলাকা পর্যন্ত এসে থমকে দাড়ায়। রাস্তার ওপর গাছ ফেলে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাদের গাড়িবহর সেখানে দাড়াল সারিবদ্ধ ভাবে। জিপ ট্রাক মিলে অনেক বড় গাড়ি বহর। পাকিস্তানি সেনারা আম গাছের ব্যারিকেড সরিয়ে রাস্তার এক পাশ দিয়ে বগুড়া শহর অভিমুখে এগিয়ে যেতে লাগলো। বাঘোপাড়া থেকে শহরে আসার পথে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করতে শতাধিক পয়েন্টে বন্দুক, বল্লম, লাঠি-শোটা, দা-কুড়াল নিয়ে প্রস্তুত থাকে সর্বস্তরের মানুষ। ঠেঙ্গামারা গ্রামের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি। ঠেঙ্গামারা গ্রামের মৃত ভোলা শেখের পুত্র তোতা মিয়া (রিক্সা চালক)[২৪৬] ও তাঁর সঙ্গীরা বাঘোপাড়া-নওদাপাড়া এলাকায় (বগুড়া-রংপুর সড়ক) গাছ কেটে রাস্তার ওপর ফেলে ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার কাজ করছিল। গাছের ডাল, বাঁশ কেটে জড়ো করছিল। এমন সময় হানাদার বাহিনির কনভয়গুলো ঠেঙ্গামারা রাস্তায় এসে পড়ে। তোতার সঙ্গীরা পালিয়ে যায়। কিন্তু আসীম সাহসী তোতা তীব্র ক্ষোভে কুড়াল উঁচিয়ে এগিয়ে যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির দিকে। পাকিস্তানি সেনারা এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে।[২৪৭] একটি গুলি এসে লাগে ঠেঙ্গামারার রিকসা চালক তোতা মিয়ার বুকে। তোতা মিয়া বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধের

ইতিহাসে প্রথম শহিদ।[২৪৮] তোতা মিয়া রাস্তায় পড়ে গেলে নিষ্ঠুর হানাদারেরা তাঁর লাশের ওপর দিয়ে তাদের গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে বগুড়া শহর অভিমুখে।

শহিদ তোতা মিয়ার কবর ও পিছনে তাঁর স্মরণে স্মৃতিসৌধ

সরলপুর শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর

মহাস্থানগড় থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিম গোকুল ইউনিয়নের সরলপুরে অগ্রহায়ন মাসের দিকে পাকিস্তানি বাহিনির গণহত্যার শিকার হন অনেক মুক্তিযোদ্ধারা। সরলপুর গণহত্যার দুইজন শহিদ হাফিজার রহমান ও শহিদ বাবুলকে মো. হামিদ আলীর জায়গায় কবর দেওয়া হয়।[২৪৯] কবর দুটি পাকা করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

সরলপুর শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর

শহিদ হাফেজ হোসেন আহাম্মদের কবর

বগুড়ায় ভার্জিনিয়া টোব্যাকো মিলে পাকিস্তানি সৈন্যরা আনুমানিক শতাধিক মানুষকে হত্যা করে পুঁতে রাখে। নিহতের মধ্যে মিল মসজিদের ইমাম হাফেজ হোসেন আহাম্মদের কবরটি পাকা করে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।[২৫০]

শহিদ বাবুল মিয়ার কবর

বগুড়ায় ভার্জিনিয়া টোব্যাকো মিলে পাকিস্তানি সৈন্যরা আনুমানিক শতাধিক মানুষকে হত্যা করে পুঁতে রাখে। নিহতের মধ্যে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা শ্রমিক বাবুল মিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তার কবরটি পাকা করে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।[২৫১]

শহিদ মাছুদুল আলম খান চান্দু

সারিয়াকান্দি উপজেলার কামালপুর ইউনিয়নের রৌহাদহ গ্রামে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা মাছুদুল আলম খান চান্দু বাড়ি। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রশিক্ষণে ভারতে যান। তিনি ৭নং সেক্টরের ৯২ প্লাটুনের কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সারিয়াকান্দির দড়িপাড়া গ্রামে পাকিস্তানি হানাদের হাতে বন্দি কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে উদ্ধার করতে চান্দুর নেতৃত্বে

মোতাকবির, আলী ফেরদৌস, লুৎফর রহমান আলাল, মঞ্জুরুল হাসান জাহেদ, বাকি প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধা সেখানে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্ধার করা সম্ভব হলেও সেখানে ঘণ্টাব্যাপী পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে গুলি লেগে চান্দু শহিদ হন। পরে তার লাশ উদ্ধার করে রৌহাদহ গ্রামে দাফন করা হয়। শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা চান্দু ক্রীড়াবিদও ছিলেন। তাই তাকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৭৩ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থা বগুড়া স্টেডিয়ামকে 'শহিদ চান্দু স্টেডিয়াম' নামকরণ করেন।[২৫২]

বগুড়ার শহিদ মুক্তিযোদ্ধা চান্দুর কবর

শহিদ টি.এম.আইউব টিটু

২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি ঢাকায় 'অপারেশন সার্চ লাইটের' নামে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। জানা যায়, রংপুর থেকে পাকিস্তানি সেনা বাহিনি বগুড়ার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এ খবর বগুড়ায় পৌঁছানোর পর কোনরকম অস্ত্র প্রশিক্ষণ ছাড়া ৭১'র ২৬ মার্চ ভোরে হানাদার বাহিনির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বন্দুক, লাঠি নিয়ে ছুটে এলো অনেক তরুণ। তাদেরই একজন বগুড়া জিলা স্কুলের ১০ম শ্রেণির ছাত্র শহিদ টি.এম.আইউব টিটু, পিতা-মৃত আছালতুজ্জামান তালুকদার (মালতিনগর)।[২৫৩] ২৬ মার্চ

ভোরে আর সকলের মত টিটুসহ ৮ জন মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নিয়েছিলেন বড় গোলার ইউনাইটেড ব্যাংকের ছাদের ওপর পাকিস্তানিদের প্রতিহত করার জন্য ।

পাকিস্তানি সেনারা যখন বগুড়া শহরের ২নং রেল ঘুমটির কাছাকাছি এসে গেলে, আজাদ রেস্ট হাউজের ওপর থেকে দারোগা নিজাম উদ্দিন, দারোগা নুরুল ইসলাম ও তাদের সহযোগীদের ৩০৩ রাইফেল গর্জে ওঠে । পাকিস্তানি সেনারা হকচকিয়ে যায় । এমন সময় ইউনাইটেড ব্যাংকের ছাদের ওপর থেকেও টিটু, ছুনু ও হিটলুর বন্দুকও গর্জে ওঠে । হানাদারেরা দিশেহারা হয়ে পরে । এক সময় হানাদাররা এই তিন জনের অবস্থান টের পেয়ে যায় । ছাদে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকলে টিটুকে গুলি লাগে । সেখানেই লুটিয়ে পরে টিটু । পরে তাঁকে বগুড়া স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন মালতিনগর পুলিশ ফাঁড়ির নিকট কবর দেওয়া হয় । দেশ মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বগুড়ার মানুষ এই দ্বিতীয় শহিদের নামে পৌর অডিটোরিয়ামের নামকরণ করে শহিদ টিটু মিলনায়তন ।[২৫৪]

শহিদ টি.এম.আইউব টিটু

শহিদ টিটু মিলনায়তন

শহিদ টি.এম.আইউব টিটু'র কবর

শহিদ জয়েন উদ্দীন খলিফা

শহিদ মুক্তিযোদ্ধা জয়েন উদ্দীন খলিফার গ্রামের বাড়ি বগুড়া সদর উপজেলার নামুজা ইউনিয়নের বড় সরলপুর গ্রামে । ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদারদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে মৃত নছির উদ্দীন খলিফার ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়েন উদ্দীন খলিফা গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শহিদ হয়েছিলেন । ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহিদ হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা জয়েন উদ্দীন খলিফার ছেলে জাহেদুর রহমান তারা (১৭) এবং এই শহিদের বড় ভাই মুক্তিযুদ্ধে বগুড়া অঞ্চলের অর্গানাইজার এ্যাডভোকেট খয়বর রহমান । মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে রাজাকার বাহিনিরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জামাতুল্লা মাঠে হত্যা করে পাশ্ববর্তি নদীর বালুর নিচে লুকিয়ে রাখে । কয়েকদিন পর তার লাশ উদ্ধার হয় । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর শহিদ এই পরিবারের নিকট লিখিতভাবে সমবেদনা জানিয়েছিলে ।[২৫৫]

মো. আমিনুল কুদ্দুস (বুলবুল)

মো. আমিনুল কুদ্দুস (বুলবুল) একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। বগুড়া জেলার সদরে তাঁর বাড়ি। তাঁর পিতার নাম সামমুছ আহমেদ। বগুড়া সদর এলাকায় তিনি যুদ্ধে করেন। তাঁর সমাধিস্থল বগুড়া জেলার কাহালু এলাকা।[২৫৬]

মো. মুস্তাফিজুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা

মো. মুস্তাফিজুর রহমান একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। তাঁর পিতা ফজলুর রহমান। বগুড়া জেলার সদর থানার জলেশ্বরীতলা গ্রামের তাঁর বাড়ি। তিনি বগুড়া সদর থানায় যুদ্ধ করেন। রহমাননগর বগুড়ায় তাঁর সমাধিস্থল।[২৫৭]

মো. হেলালুর রহমান চিস্তি, মুক্তিযোদ্ধা

মো. হেলালুর রহমান চিস্তি একজন মুক্তিযোদ্ধা। পিতা : মো. শুনছুর রহমান চিস্তি। বগুড়া জেলায় তাঁর বাড়ি। তিনি বগুড়া সদর থানায় যুদ্ধে শহিদ হন। বগুড়া কলোনি স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন স্থানে মো. হেলালুর রহমান চিস্তি'র সমাধিস্থল।[২৫৮]

হাফিজুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা

হাফিজুর রহমান একজন মুক্তিযোদ্ধা। বগুড়া জেলার সদর থানায় তাঁর বাড়ি। গোকুলের রেইড যুদ্ধে শহিদ হন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[২৫৯]

কাহালু উপজেলা

নশিরপাড়া শহিদের কবর

নশিরপাড়া গণহত্যায় শহিদের পাকিস্তানি বাহিনি চলে যাওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসী তাদেরকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করেন। তাদের কবরগুলো এখন জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে। স্মৃতি রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

জয়তুল গ্রাম শহিদের কবর

জয়তুল গ্রাম গণহত্যায় শহিদের পাকিস্তানি বাহিনি চলে যাওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসী তাদেরকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন

করেন। তাদের কবরগুলো এখন জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে। স্মৃতি রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

শাজাহানপুর উপজেলা

শহিদ মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ

শহিদ মাসুদ আহমেদ ৯ মে ১৯৫২ সালে গোহাইল রোডের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম ড. টি আহমেদ (তফিজ উদ্দিন আহমেদ), মাতা-মরহুমা জয়নাব আহমেদ।[২৬০] তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলে প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে বগুড়া জেলা স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সহিত এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরবর্তীকালে বগুড়া আযিযুল হক কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্র জীবনে একজন স্কাউট হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯৭১ সালে বগুড়া আযিযুল হক কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় বছরে এইচ.এস.সি অধ্যায়নরত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বগুড়া থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে আড়িয়া বাজার এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনির ২৩ ব্রিগেডের ৯৬ আই পি পি (অ্যামুনিশন পয়েন্ট) অবস্থিত। এখান থেকে বগুড়ার আশে পাশে বিভিন্ন জায়গায় অ্যামুনিশন সরবরাহ করা হতো। এই অ্যামুনিশন ডিপুটি তখন মেজর নূর মোহাম্মাদ নামে এক পাঞ্জাবির অধীনে ছিল। ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য অ্যামুনিশন পয়েন্ট পাহাড়া দিতো। এই ডিপুতে বেশ কিছু পশ্চিমা মিলিটারি ও বাঙালি মিলিটারি যৌথ ভাবে অবস্থান করতো।

১ এপ্রিল ১৯৭১ পশ্চিমা মিলিটারিরা যুক্তি করে বাঙালি মিলিটারিদের বলল– তোমরা গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড দাও। তখন বাঙালি মিলিটারিরা গাছ কাটার জন্য ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যায়। এ দিকে পশ্চিমা মিলিটারিরা ওয়ারলেসের মাধ্যমে ফাইটার বিমানে খবর দেয় বাঙালি মিলিটারিদের ওপর বোমা ফেলার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যে

২ টা ফাইটার বিমান এসে কয়েকটি বোমা ফেলে চলে যায়। এতে ৩ জন বাঙালি মিলিটারি আহত হয়। তাঁদেরকে সাইকেলে করে গ্রামের লোকজন মোহাম্মাদ আলী হাসপাতালে নেওয়ার সময় ঘটনা শহরময় ছড়িয়ে পরে। এ খবর পেয়ে নায়েব সুবেদার আলী আকবর তখনকার হাই কমান্ড গাজীউল হক সাহেবের অনুমতিক্রমে আড়িয়া বাজার এর দিকে এগুতে থাকেন। সাথে ৩৯ জন এ.পি.আর, ৫০ জন পুলিশ বাহিনির লোক আর ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা। এই ২০ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে এক জন ছিল মাসুদ আহমেদ।

বেলা এগারোটা নাগাদ আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম এই তিন দিক থেকে ঘেরাও করা হলো। শুরু হলো যুদ্ধ। দু'পক্ষ থেকে গুলি বৃষ্টি চলছে। এরই মধ্যে বিমান আক্রমণ শুরু হলো। সব কিছু উপেক্ষা করে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে আশ পাশের শত শত গ্রামবাসী সেনাক্যাম্প আক্রমণকারী বাঙালি তরুণদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। বিমান তাড়াতে গ্রামের লোকজন টিনের ক্যানেস্তারা পেটাতে লাগলো। কেউ কেউ বাঁশের তৈরি একধরনের যন্ত্র বাজিয়ে বিকট শব্দ করে বিমান তাড়াতে চেষ্টা করল। সে দিন বইছিল জোর দক্ষিণা হাওয়া। গ্রামের লোকদের অনুরোধ করা হলো, তারা যেন দক্ষিণ দিক থেকে মরিচের গুড়া ছিটিয়ে দেয়। কোথায় থেকে এত মরিচের গুড়া এল জানা গেল না। এক সময় সবার চোখ-মুখ জ্বলতে লাগলো। ইতোমধ্যে মাসুদ তাঁর সুদক্ষ কৌশলে ৩ জন পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যা করে। বেলা আড়াইটার দিকে আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট এ সাদা পতাকা উড়ল। তখন আনন্দের আতিশয়ে তাঁর কাঁটার বেড়া ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চলে অসীম সাহসী যোদ্ধা মাসুদ পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ করানোর জন্য। এমন সময় ক্যাম্পের পিছনে ট্রেঞ্চে লুকিয়ে থাকা ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মাদ মাসুদ কে লক্ষ্য করে গুলি করে। সে গুলি মাসুদের মাথা ভেদ করলে ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মাদ সহ ৬৮ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এদের মধ্যে ২১ জন ছিল পাঞ্জাবি। ঐ সব পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের পরিবারকে বন্দি করে মাসুদের লাশ সহ বগুড়ায় আনা হলো। বন্দিদেরকে রাখা হয় জেলখানায়। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতার ক্রোধ থেকে সে দিন বন্দিরা বাঁচতে পারেনি।

জেলখানার তালা ভেঙ্গে ক্ষুব্ধ জনতা বন্দিদেরকে বের করে নিয়ে এসে কুড়াল, বটি দিয়ে কুপিএ তাদেরকে হত্যা করে। ও দিকে রাতে ২১ টি গান স্যালুটের মাঝে মাসুদ কে পারিবারিক কবরে সমাহিত করা হয়।

মাসুদের আত্মত্যাগ কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য স্বাধীনতার পর পরই তাঁর নামানুসারে আড়িয়া বাজারের নামকরণ করা হয় 'মাসুদ নগর'। যদিও 'মাসুদ নগর' নাম টি শুধু একটা ফলকেই রয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত নামটি তেমন প্রচলিত হয় নি। এবং জেলা পরিষদের সাবেক জিন্না হল কে 'মাসুদ মিলনায়তন' নাম দেওয়া হয়েছিল, যা কালের কবলে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপের কার্যালয়। এ ছাড়াও গোহাইল রোডের পশু হাসপাতালের কোনায় মাসুদ ও সাইফুল স্মরণে একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।[২৬১]

উপর্যুক্ত গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর ছাড়াও বগুড়ায় আরও বেশকিছু বধ্যভূমি ও গণকবরের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। মায়ন সোনার ঘাট বধ্যভূমি,[২৬২] মেরপুরের মাকরড়খোলা, বামুজা ও পানদিঘী গণহত্যা, শিকড় ও কালিয়ার পুকুর গণহত্যা, কাহালু থানা চত্বর বধ্যভূমি, কাহালু রেল লাইনের দক্ষিণ পাশে (উলট্ট) কালাই রাজবাটি, কাহালু নাগর নদী পাশে অবস্থিত বধ্যভূমি ইত্যাদি।[২৬৩] লতিফপুর

বীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ

শহিদ মাসুদ আহমেদ এর কবর

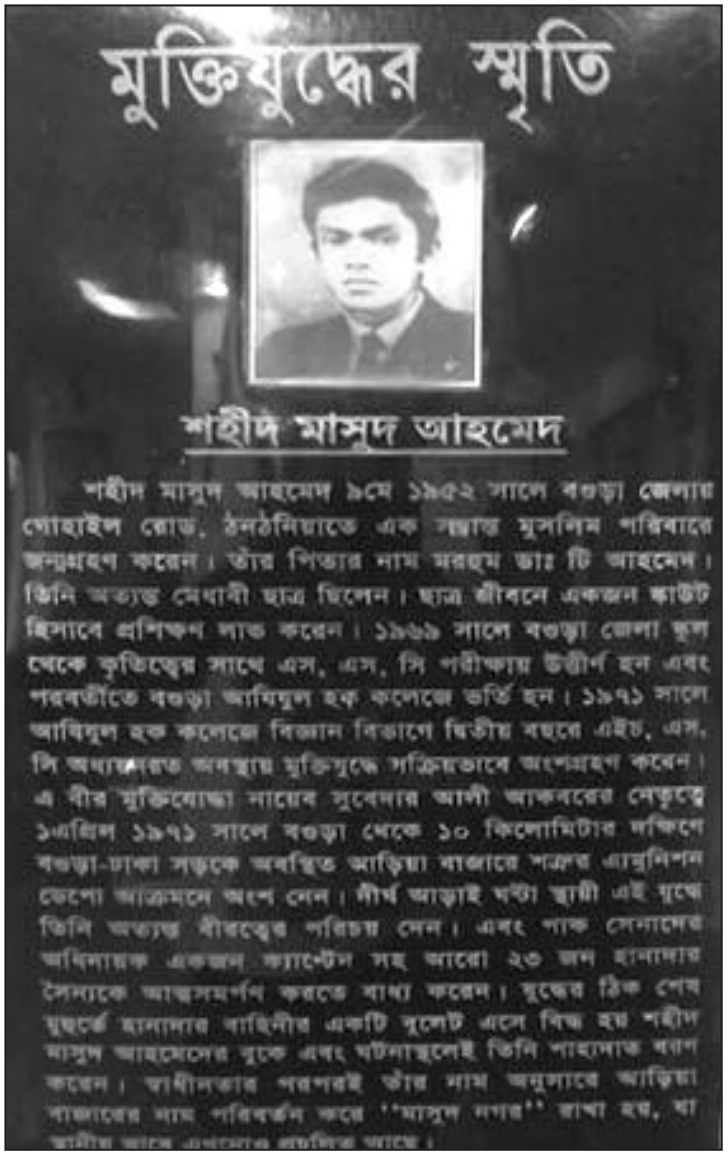

বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট এ 'বিজয়াঙ্গন' যাদুঘরে রক্ষিত মাসুদ এর 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি'

গোহাইল রোডে পশু হাসপাতালের কোনায় মাসুদ ও সাইফুল স্মরণে শহিদ মিনার

কলোনী, চকফরিদ, ঠনঠনিয়া, মালগ্রাম, গণ্ডগ্রাম,[২৬৪] কাটনারপাড়া, সূত্রাপুর,[২৬৫] সুলতানগঞ্জপাড়া, নিশিন্দারা, আটাপাড়া, মাটিডালি, বেতগাড়ি প্রভৃতি স্থানের শত শত ব্যক্তিকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারে।[২৬৬] খান্দারের দিঘিরপাড়,[২৬৭] আকাশতাড়া, ঘোনা প্রভৃতি ছিল এই হত্যালীলার স্থান।[২৬৮]

বগুড়া মুক্ত হবার দিন

১২ ডিসেম্বর বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলা প্রথম পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হয়। ১৩ ডিসেম্বর মুক্ত হয়েছে দুপচাঁচিয়া, কাহালু, নন্দীগ্রাম ও বগুড়া সদর উপজেলা। ১৪ ডিসেম্বর শিবগঞ্জ ও ধুনট উপজেলা মুক্তি হয়। গাবতলী থানা পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হয় ১৫ ডিসেম্বর। শেরপুর উপজেলা ১৬ ডিসেম্বর হানাদারমুক্ত হয়। তবে ১৮ ডিসেম্বর পুরোপুরি বগুড়া পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হয়।

স্মৃতি সংরক্ষণ ও স্মারক

শহিদের স্মরণে বগুড়ায় স্মৃতিসৌধ, ভাস্কর্য, সড়ক ও প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে। শহরের সাতমাথায় ভাস্কর্য 'বীর বাঙালি' তৈরি করা হয়েছিল। পরে এই ভাস্কর্যটি শহরের প্রবেশ মুখ বনানীতে পর্যটন মোটেলের সামনে স্থাপন করা হয়েছে। শহরের সাতমাথায় 'বীরশ্রেষ্ঠ স্কয়ার' নামে একটি স্মৃতিসৌধ করা হয়েছে। বগুড়া রেল ষ্টেশনে বধ্যভূমিতে একটি স্মৃতিসৌধ, শহরের ফুলবাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, শহিদ খোকন পার্ক এবং শহিদ টিটুর নামে একটি মিলনায়তনের নামকরন করা হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বাকির স্মরণে সড়ক, হিটলু, আজাদ, ছুনুসহ আরও বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার নামে সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। অধ্যক্ষ মহসিন আলী দেওয়ানের নামে হয়েছে সড়কের নামকরণ।

এছাড়া বগুড়ায় ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি জাদুঘর। যেখানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জীবন্ত মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত স্থলমাইন, পাকিস্তানি সেনাদের ব্যবহৃত যুদ্ধবিমানের চাকা, হেলমেট, পানির পট, জুতা, ব্যাগ, কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধার ব্যবহৃত পোশাক- সবই আছে। এই জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা তৌফিক হাসান ময়না। ১৯৯০ সালে তিনি লেগে যান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম ও আলোকচিত্র সংগ্রহের কাজে। ১৯৯৫ সালের পর মোটামুটি পরিপূর্ণ একটি রূপ পায় জাদুঘরটি। বগুড়া পৌর পার্কে অবস্থিত উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরির পাশের একটি ছোট কক্ষে স্বল্প পরিসরে শুরু করেন গুরুত্বপূর্ণ এই স্মৃতিচিহ্নগুলো সংরক্ষণের কাজ। এই জাদুঘরে সংগৃহীত স্মারকসংখ্যা এক হাজার। এর মধ্যে ৩০০টি আলোকচিত্র, ১০০টি দলিলপত্র, ১০০টি পত্রিকা কাটিং ও ৫০০টি অন্যান্য স্মারক। এগুলোর মধ্যে অল্প কিছু স্মারক তিনি প্রদর্শনীর জন্য রেখেছেন। বাকিগুলো তাঁর কাছে সংগৃহীত আছে। এ প্রজন্মের তরুণদেরকে মুক্তিযুদ্ধো সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে এই সব

স্মারক। তবে পৌরসভার নানা জটিলতার কারণে জাদুঘরটি এখন সাধারণ মানুষের প্রদর্শনের জন্য নিয়মিত খোলা হয় না।[২৬৯]

আদমদীঘি উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধে শহিদের স্মরণে বিভিন্ন ধরণের স্থাপনা হয়েছে– শহিদ সূজিত গেট, সান্তাহার পূর্ব ঢাকা রোড সংলগ্ন; আব্দুল লতিফ, শাওইল সড়ক; আসলামুদৌলা সড়ক, সান্তাহার ঘোড়াঘাট; আব্দুল মজিদ সড়ক, ছাতিয়ানগ্রাম; শহিদ আজিজার সড়ক; আইনূল-ময়নূল সড়ক, সান্তাহার হার্ভে স্কুল রোড; পুলক সরকার, হাসপাতাল সড়ক; শাহাজাহান, খাড়িয়াকন্দি; জালাল হোসেন, মুরুইল সড়ক; স্বাধীনতা স্মৃতি স্তম্ভ নির্মণাধীন, সান্তাহার রেলগেট চত্বর, আদমদীঘির শ্মশানঘাট স্মৃতিস্তম্ভ।[২৭০]

দুপচাঁচিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত স্থাপনা সমূহ– দুপচাঁচিয়া তেমাথা বাজার থেকে থানা সড়কটি শহিদ মুক্তিযোদ্ধা আজিজার রহমানের নামে নামকরণ, ডিমশহর গ্রামের রাস্তাটি শহিদ মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম, তালোড়া রেলঘুমটির রাস্তাটি শহিদ মুক্তিযোদ্ধা মনছুর আলী সড়ক, তালোড়া দেবখন্ড-চৌমুহনী রাস্তাটি মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী, গুনাহার ইউনিয়নের পৌওতা রাস্তাটি মুক্তিযোদ্ধা খগেন্দ্রনাথ বর্মন এর নামে নামকরণ, দুপচাঁচিয়া-তালোড়া সড়কের পদ্মপুকুরে বধ্যভূমি স্মৃতিফলক, দুপচাঁচিয়া পৌর গোরস্থানে প্রথম শহিদ মুক্তিযোদ্ধার নামফলক রয়েছে। উপজেলা পরিষদের দক্ষিণ পাশে মুক্তিযোদ্ধাদের নামফলক তালিকা সহ স্মৃতি অম্লান নির্মিত করা হয়েছে।

কাহালু উপজেলা চত্বর নামফলক, মহেশপুরে একটি সকড় মুক্তিযোদ্ধার নামে রয়েছে। এছাড়া কাহালু উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে।[২৭১]

নন্দীগ্রাম উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্তদের স্মরণে– শহিদ আকরাম সড়ক ও শহিদ আকরাম স্মৃতি সংঘ ক্লাব রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সারিয়াকান্দির শহিদ বীর মুক্তিযুদ্ধা মমতাজুর রহমানের নামে উপজেলার নামকরণ করা হলেও তা পরবর্তীকালে বাস্তব রূপ লাভ করেনি। সারিয়াকান্দিও কালিতলা হতে কুতুবপুর পর্যন্ত সড়কের নাম করণ করা হয় শহিদ মমতাজুর রহমান মুন্টর নামে। কুতুবপুর হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত সড়কের নাম করণ করা হয় শহিদ

মুক্তিযোদ্ধা চান্দুর নামে। ফুলবাড়ি হতে বালুয়ারতাইড় পর্যন্ত সড়কের নাম করণ করা হয় শহিদ মমতাজুর রহমানের নামে।

শেরপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে বেশকিছু স্থাপনা আছে– শহিদ ক্ষিতিশ চন্দ্র পাল-এর স্মরণে শেরপুর কলেজ রোড থেকে পূর্বদিকে পৌরসভা বরাবর (নবনী সিনেমা হল সংলগ্ন), শহিদ রঞ্জন সড়ক ছিল। এই সড়কের এখন অস্তিত্ব নেই।

মুক্তির ফুলবাড়ি : ১৯৭১ সালের বগুড়া জেলায় বিভিন্ন উপজেলায় শহিদদের তালিকা

কেল্লাকুশী রোড (শেরপুর বাসস্ট্যান্ডের পাশে) মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য করা হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। এসময় মুক্তিযোদ্ধা মুজিবর রহমান মজনু পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। 'এক বালক মুক্তিযোদ্ধার হাতে জাতীয় পতাকা'-এমন অসাধারণ ভাস্কর্যটির অস্তিত্ব এখন আর নেই। এরপর ১৯৮৮ থেকে ১৯৮৯ সালের দিকে শেরপুর বিকেল বাজারের পূর্বদিকে টাউন বারোয়ারি পূজামণ্ডপের সামনে 'মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য' স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের এ ভাস্কর্য স্থানান্তরিত করে পৌরসভার উত্তর শাহপাড়া শিশুপার্কের সামনে শহিদ মিনারে স্থাপন করা হয়। পৌরসভার চারমাথার সামনে কর্মকারপাড়া এলাকায় শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে নামফলক স্থাপন করা হয়।

শহিদ মুক্তিযোদ্ধা হাফিজার রহমান শেখের নামে শিবগঞ্জ উপজেলা অডিটোরিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে।

সাত মাথা : সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের নামে স্মৃতিস্তম্ভ

সোনাতলা উপজেলার ভেলুর পাড়ার লোহাগাড়া নামকস্থানে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. খজানাজিম উদ্দিনের নাম অনুসারে খাজারমোড় নামে

শহিদ চান্দুর নামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম

একটি মোড় পাওয়া যায়। এবং সোনাতলা রেলওয়ের মাঠে শহিদ সাবুর নামে একটি ক্লাব পাওয়া যায়। সোনাতলায় পিটিআই কলেজে ৭ জন

সোনাতলা পিটিআই : সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের নামে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ

বীরশ্রেষ্ঠের ছবিসহ স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে শাজাহানপুর উপজেলার ডেমাজানি উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম করা হয়েছে, ডেমাজানি শহিদ মোকলেছুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় করা হয়েছে। আড়িয়া বাজারের নাম মাসুদনগর করা হয়েছে। তবে এই নামে এখন আর কেউ ডাকে না। বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে বাবুরপুকুরে গনকবর স্মৃতিফলক করা হয়েছে।

ধুনটে শহিদের উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে।[২৭২]

মূল্যায়ন

প্রধমত, প্রথম দিকে হিন্দু, আওয়ামী লীগ কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করলেও পাকিস্তানিরা পরবর্তীকালে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করে। উদাহরণস্বরূপ ১১ নভেম্বর সেহেরি খাওয়ার সময় শহরের ঠনঠনিয়া, খান্দার এলাকা থেকে ১৭ জনকে স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনি তুলে নিয়ে বাবুরপুকুর নামক স্থানে গুলি করে হত্যা করে।

দ্বিতীয়ত, গণহত্যাগুলোর বেশির ভাগ সংঘটিত হয় পরিকল্পিতভাবে। এ পরিকল্পনায় তাদের সহযোগিতা করে রাজাকার, আল বদর, আল শামস ও বিহারি সম্প্রদায়। মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৭২ সালের পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী বগুড়ায় ২৫,০০০ জন শহিদের কথা উল্লেখ করার হয়েছে। এই সংখ্যা আমাদের জরিপে গণহত্যার যে মাত্রা আঁচ করা যায় তা থেকে অনেক কম।

তৃতীয়ত, বগুড়ায় যে গণহত্যাগুলো সংঘটিত হয় তার মধ্যে ৫টি শরণার্থী দলের ওপর।

চতুর্থত, ১০টির বেশি গণহত্যা সংঘটিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে।

পঞ্চমত, বাস ও ট্রেন থামিয়ে যাত্রীদের হত্যা করার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

ষষ্ঠত, পাকিস্তানি বাহিনির ক্যাম্পগুলো এক একটি বধ্যভূমি। যেখানে বন্দি করে রেখে অত্যাচার করা হতো নীরিহ জনগণকে। পরে হত্যা করা হতো।

সপ্তমত, বগুড়ায় যে গণহত্যাগুলি সংঘটিত হয় তাতে মূলত পাকিস্তানি সৈন্যরাই অংশগ্রহণ করে।

অষ্টমত, এই গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনি ব্যবহার করে আধুনিক অস্ত্র রাইফেল ও মেশিনগান। এবং পাকিস্তানি বাহিনির দোসররা গণহত্যায় ব্যবহার করে– বন্দুক, রাম দা, বল্লম, চাপাতি ও তলোয়ার।

নবমমত, অনেকগুলো গণহত্যা সংঘটিত হয় বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। তারা আওয়ামী লীগ নেতাদের খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করে।

দশমমত, পাকিস্তানি বাহিনি গণহত্যার পূর্বে চেষ্টা করে বাঙালি রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শিক অবস্থান পরিবর্তন করে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করার কিন্তু তাতে তারা ব্যর্থ হয়।

একাদশ, পাকিস্তানি বাহিনি নিষ্ঠুর আচরণ করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তা একটি উদাহরণে মাধ্যমে তুলে ধরা হলো– একদিন কয়েকজন নিরীহ বাঙালিকে দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের মালপত্র ট্রেনে ওঠালো। তারপর কাজ শেষে শুরু হলো আমানুষিক অত্যাচার। সৈন্যরা তাদের ওয়াগানের পিছনে নিয়ে দু'পা সামনে করে পায়ের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে বসিয়ে রাখলো। তারপর কয়েকজন উঠলো তাদের পিঠের ওপর। জীবন্ত মানুষের হাড়গুলো এভাবে ভেঙ্গে দিলো। এর পর তাদের যথারীতি হত্যা করা হলো। পাকিস্তানি দস্যুরা এই রেল স্টেশনের আশেপাশে অহরহই মানুষদের এমনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতো।[২৭৩]

দ্বাদশ, বাংলাদেশের বেশির ভাগ জায়গায় দেখা গেছে হিন্দু ও হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের হত্যা করা হয়েছে কিন্তু বগুড়ায় এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। রামশহরে পীর পরিবারের সকল সদস্যকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ কোষ, দ্বিতীয় খণ্ড*-এ মোট ৯০৫টি গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের তালিকা তুলে ধরেছেন যা এ যাবৎকালে সবথেকে বড় সংগ্রহ। কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ নয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক মামুন সিদ্দিকী এক প্রবন্ধে কুমিল্লার ৫৫টি গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের তালিকা তুলে ধরেছেন।[২৭৪] আহম্মেদ শরীফ নীলফামরী বিষয়ক একটি গবেষণায়

৫০টি গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের তালিকা তুলে ধরেছেন।[২৭৫] আলোচ্য গ্রন্থে বগুড়ার ১৫৩টি গণহত্যার নির্দশন তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে যদি প্রত্যেক জেলায় গড় ৫০টি গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে তা হলে বাংলাদেশে প্রায় ৩২০০টি গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের নিদর্শন পাওয়ার কথা। তাই আমাদের এখনই সারাদেশে গবেষণা পরিচালনা করা উচিত যাতে মুক্তিযুদ্ধের এই সব নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় এবং সংরক্ষণ করা যায়।

বগুড়ায় ১৫৩টি গণহত্যা সংঘটিত হলেও তা বেশির ভাগ অনালোচিত। বেশির ভাগ গণহত্যার স্থলে এখনো নির্মিত হয়নি কোন স্মৃতি স্তম্ভ। এ ছাড়া শহিদের স্মরণে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। শহিদ পরিবারগুলোর দাবি শহিদের নামে এলাকার স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাটের নামকরণ করে তাদের স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একই সাথে দাবি করেছে এলাকায় জনগণ, পাঠাগার স্থাপনের যেখানে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বই থাকবে, যা পড়ে পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির মহান সংগ্রাম। এই সংগ্রামের শহিদরা তাঁদের সর্বচ্চো আত্মত্যাগ করেছেন। শহিদের প্রতি তখনই শ্রদ্ধা জানানো হবে যখন তাদের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব।

উপসংহার

নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আর এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের দিতে হয়েছে অনেক বেশি মূল্য। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল সমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী শুধু অত্যাচার নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চালিয়েছে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা। আর এ সব অত্যাচার, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনিকে সহযোগিতা করেছে তাদের এদেশী দোসর রাজাকার, আল বদর, আল শামস ও অবাঙালি বিহারি সম্প্রদায়। পাকিস্তানি বাহিনি পুরো বগুড়া জেলায় মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস চালায় নির্যাতন ও গণহত্যা। বগুড়াতে গণহত্যার নিদর্শন হিসেবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বধ্যভূমি, গণকবর, শহিদ কবর ও নির্যাতন কেন্দ্রগুলো।

কিন্তু বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের গ্রন্থে তেমন স্থান পায়নি। আমাদের এই জরিপের পূর্বে ডা. এম এ হাসানের *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ* গ্রন্থে মোট ৬টি বধ্যভূমি ও গণকবরে কথা তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ* দ্বিতীয় খণ্ডে মোট ১৪টি বধ্যভূমি ও গণকবরে কথা তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের এই জরিপে বগুড়া জেলায় মোট ১৫৩টি গণহত্যার নিদর্শন বধ্যভূমি, গণকবর, শহিদ কবর ও নির্যাতন কেন্দ্র চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর, শহিদ কবর ও নির্যাতন কেন্দ্র উপজেলা প্রতি হিসেবে দেখা যাচ্ছে– আদমদীঘি ৯টি, কাহালু ১২টি, গাবতলী ৮টি, দুপচাঁচিয়া ৯টি, ধুনট ৮টি, নন্দীগ্রাম ৬টি, বগুড়া সদর

৫৮টি, শাজাহানপুর ১০টি, শিবগঞ্জ ১০টি, শেরপুর ৯টি, সারিয়াকান্দি ৪টি, সোনাতলা ১০টি। যা আমাদের মতে এখনো অসম্পূর্ণ। কারণ বিগত ৪৬ বছরে অনেকে বধ্যভূমি ও গণকবর বিলুপ্ত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। যারা জীবিত আছে তাদেরও অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন। আবার অনেকেই এই বিষয়গুলো নিয়ে মুখ খুলতে চান না। তাই আমাদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত সব বধ্যভূমি, গণকবর, শহিদ কবর ও নির্যাতন কেন্দ্র তুলে নিয়ে আসা সম্ভব হয় নি।

বগুড়াতে গণহত্যার নিদর্শনসমূহ একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধারা হল–

উপজেলার নাম	গণহত্যা	বধ্যভূমি	গণকবর	শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর	নির্যাতন কেন্দ্র	মোট সংখ্যা
আদমদীঘি	৪	৩	-	-	২	৯
কাহালু	৪	১	২	২	৩	১২
গাবতলী	৩	১	২	-	২	৮
দুপচাঁচিয়া	১	২	৩	-	৩	৯
ধুনট	৫	১	১	-	১	৮
নন্দীগ্রাম	৩	-	-	-	৩	৬
বগুড়া সদর	১০	১৭	৮	১১	১২	৫৮
শাজাহানপুর	২	২	-	১	৫	১০
শিবগঞ্জ	৪	১	১	-	৪	১০
শেরপুর	৩	৩	১	-	২	৯
সারিয়াকান্দি	৩	-	-	-	১	৪
সোনাতলা	৩	২	২	-	৩	১০
মোট=	৪৫	৩৩	২০	১৪	৪১	১৫৩

মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ* দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু মাত্র বগুড়া শহরে পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা ২৭৬ জন বাঙালির শহিদ হওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে।[২৭৬] পাকিস্তানি সৈন্যদের এ কাজে সহযোগিতা করেছে বিহারিরা ও তাদের দ্বারা গঠিত বিভিন্ন সংগঠন যার মধ্যে অন্যতম হল– অবাঙালি যুবকদের নিয়ে গঠন করা ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স। কিন্তু এই জরিপে কার্যে বগুড়ার বিভিন্ন উপজেলায় গণহত্যার যে তীব্রতাতার আঁচ পাওয়া গেছে তা থেকে এ ধারণা করা যায় শহিদের সংখ্যা উল্লেখিত শহিদের সংখ্যার থেকে কয়েকগুণ বেশি।

মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বেশির ভাগ গণহত্যার স্থলে এখনো নির্মিত হয়নি কোন স্মৃতি স্তম্ভ, শহিদের স্মৃতিও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। বগুড়া জেলা এর ব্যতিক্রম নয়, এখানে প্রায় এক শ' সেনা ও রাজাকার ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পগুলো পরিণত হয়েছিল এক একটা বধ্যভূমি ও নারী নির্যাতনের কেন্দ্রে। পাকিস্তানি বাহিনির গণহত্যার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এসব বধ্যভূমি ও গণকবর। কিন্তু আজও আমরা এই সব বধ্যভূমি ও গণকবরের অনেকগুলো চিহ্নিত করতে পারি নি। শুধু তাই নয়, চিহ্নিত সব বধ্যভূমি ও গণকবর এখনো সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নি। এর কারণ বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির বেশ শক্ত অবস্থান ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে কর্তৃপক্ষের অবহেলা।

মুক্তি অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী শুধু অত্যাচার নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয়নি। বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা চালিয়েছে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা। গণহত্যার সাক্ষী এই সব বধ্যভূমি ও গণকবর সংরক্ষণের মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্মের সবার উচিত একটি স্মৃতি কথা রচনা করা। যে স্মৃতি কথাগুলো পরবর্তীকালে হবে ইতিহাস রচনার আকর। আমাদের দায়িত্ব ইতিহাস সচেতন হওয়া। ইতিহাসে উৎস ও গণহত্যার এই নিদর্শনগুলো যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। একই সাথে যুগের সেতু বন্ধন হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়া। এজন্য সব থেকে বড় ও কার্যকর অস্ত্র হলো মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি করা।

তথ্যপঞ্জি

১. মামুন সিদ্দিকী, 'কুমিল্লা ১৯৭১: গণহত্যা, গণকবর ও বধ্যভূমির পরিচয়', *স্থানীয় ইতিহাস*, সংখ্যা ১৪, ২০১৫, পৃ. ১৪৯

২. এম এ হাসান, *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ*, ওয়ার ক্রাইমস্ ফ্যাক্টস্ ফাইন্ডিং কমিটি জেনোসাইড আর্কাইভ এন্ড হিউম্যান স্টাডিস সেন্টার, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪২২

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৩

৪. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*- দ্বিতীয় খন্ড, সময়, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৫

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

৬. *ঐ*, পৃ. ১৬৭

৭. *ঐ*, পৃ. ১৬৮

৮. *ঐ*, পৃ. ১৯৯

৯. *ঐ*, পৃ. ২০৬

১০. *ঐ*, পৃ. ২২৫

১১. *ঐ*, পৃ. ২৪৯

১২. *ঐ*, পৃ. ৩০৫

১৩. *ঐ*

১৪. *ঐ*, পৃ. ৩৫২

১৫. *ঐ*, পৃ. ৪২১

১৬. *ঐ*, পৃ. ৪৭৫

১৭. *ঐ*, পৃ. ৫৩৯

১৮. সেলিনা শিউলী, *বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩১-৩২

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৫

২০. *ঐ*, পৃ. ৪৬-৪৭

২১. *ঐ*, পৃ. ৪৯

২২. *ঐ*

২৩. *ঐ*

২৪. *ঐ*, পৃ. ৬০-৬১

২৫. *ঐ*, পৃ. ৬১-৬৩

২৬. *ঐ*, পৃ. ৬৪

২৭. *ঐ*, পৃ. ৬৫

২৮. *ঐ*, পৃ. ৬৫-৬৬

২৯. *ঐ*, পৃ. ৬৬-৬৮

৩০. *ঐ*, পৃ. ৭৩ -৭৮

৩১. *ঐ*, পৃ. ১১৩-১১৪

৩২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড [প্রাচীন যুগ], জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ৮

৩৩. *eBanglaPedia*

৩৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৩৫. *eBanglaPedia*

৩৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৩৭. bn.banglapedia.org/index.php.title পুণ্ড্রবর্ধন

৩৮. *প্রাগুক্ত*

৩৯. *ঐ*

৪০. *ঐ*

৪১. *ঐ*

৪২. *ঐ*

৪৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৪৪. 'বুঘরা খান ১২৮১ খৃস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১২৮৭ খৃস্টাব্দে পিতার মৃত্যু পর্যন্ত লখনৌতিতে দিল্লীর শাসনকর্তা হিসেবে শাসন করেন। তাঁর পিতা সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন ছিলেন দিল্লীর সুলতান। ১২৮৫ খৃস্টাব্দে জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাম্মদের মৃত্যু হলে বলবন শোককাতর হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বুঘরা খানকে দিল্লীতে গিয়ে সিংহাসনে বসার জন্য ডেকে পাঠান। কিন্তু বুঘরা খান বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে এতই জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি দিল্লীতে দুইমাস অবস্থান করে লখনৌতিতে ফিরে আসেন। ১২৮৭ খৃস্টাব্দে বলবনের মৃত্যু হলে উজির নিযামউদ্দীন বলবনের মনোনয়ন উপেক্ষা করে বুঘরা খানের ১৮ বৎসর বয়স্ক পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসান। পিতার মৃত্যুর পর বাংলাদেশে বুঘরা খান নিজেকে স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা করেন এবং নাসিরউদ্দীন মাহমুদ উপাধি ধারণ করেন।'

মুহম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, সপ্তদশ সংস্করণ মে ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১৭৬

৪৫. *ঐ*

৪৬. মামুন রশীদ, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস : বগুড়া জেলা*, তাম্রলিপি, ২০১৭, ঢাকা, পৃ. ১৮

৪৭. সূত্র, *আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

http://bn.banglapedia.org/index.php?

৪৮. মামুন রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

৫০. সূত্র, *আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

http://bn.banglapedia.org/index.php?

৫১. মামুন রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

৫২. http://bn.banglapedia.org/index.php?

৫৩. সূত্র, *আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৫৪. http://bn.banglapedia.org/index.php?

৫৫. *ঐ*

৫৬. *ঐ*

৫৭. *ঐ*

৫৮. *ঐ*

৫৯. *ঐ*

৬০. *ঐ*

৬১. *ঐ*

৬২. *ঐ*

৬৩. *ঐ*

৬৪. *ঐ*

৬৫. সাক্ষাৎকার : বজলুর প্রামাণিক (৫৮), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শলিগ্রোম, ইউনিয়ন : ছাতিনগ্রাম, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

৬৬. http://bn.banglapedia.org/index.php?

৬৭. গাজীউল হক, 'সশস্ত্র প্রতিরোধ বগুড়া', *যুদ্ধদলিল.কম*, তারিখ : ২১ আগস্ট ১৯৮৩

http://zuddhodolil.com

৬৮. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫

৬৯. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আলহাজ্ব মোঃ মমতাজ উদ্দিন, পিতা: মোবারক আলী, মাতা: গোফুরুন নেসা, পেশা: ব্যবসা, ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা: কাটনারপাড়া, ডাকঘর/উপজেলা: বগুড়া, ১৬ এপ্রিল ২০১৪

৭০. বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক তোফাজ্জল হোসেন, অধ্যক্ষ, বগুড়ার আমর্ড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন স্কুল ও কলেজ, বগুড়া

৭১. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: অ্যাড. রেজাউল করিম মন্টু, পিতার নাম: মৃত ইমারত আলী, পেশা: আইনজীবী, সাক্ষৎকার গ্রহণের স্থান: জলেশ্বরীতলা, বগুড়া, ২৫ মার্চ ২০১৪

রেজাউল করিম মন্টু, *প্রাগুক্ত*

৭২. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯

এম এ হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩

৭৩. রেজাউল করিম মন্টু, *প্রাগুক্ত*

৭৪. এম এ হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২

৭৫. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. হামিদ আলী (৬৬), পিতা : মনুশাহ, গ্রাম: সরলপুর, ইউনিয়ন : গোকুল, উপজেলা : বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

৭৬. মামুন রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

৭৭. ইব্রাহিম হোসেন, 'মা ভেবেছিল আমি যুদ্ধে মারা গেছি', *কালের কণ্ঠ*, ৮ ডিসেম্বর, ২০১৬

৭৮. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৩

৭৯. সাঈদ বাহাদুর, *গণহত্যা ও বধ্যভূমি ৭১*, মুক্তচিন্তা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১০৯

৮০. সাঈদ বাহাদুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৮১. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

৮৩. সাঈদ বাহাদুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮

৮৪. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

৮৫. http://bn.banglapedia.org/index.php?

৮৬. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

৮৭. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: হামিদুল ইসলাম ফটিক, ধুনট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার (ডেপুটি), ধুনট, বগুড়া, তারিখ : ৩০ জুন ২০১৭

৮৮. মোঃ জালাল উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*

৮৯. http://bn.banglapedia.org/index.php?

৯০. মোঃ জালাল উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*

৯১. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৫

৯২. এম এ হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১

৯৩. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৫

৯৪. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. আব্দুস সামাদ মাস্টার, গ্রাম : চাকলমা, পো. মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৯৫. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (৬৫), পিতা : মৃত নূরুল ইসলাম মণ্ডল, মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : মালাহার, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৯৬. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: হাজী মোসলেম উদ্দিন, পিতা: মুখো প্রাং, গ্রাম: লক্ষীপুর, উপজেলা : কাহালু, জেলা: বগুড়া, তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৭

৯৭. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: ভেলু চন্দ্র, পিতা-লক্ষন চন্দ্র, গ্রাম: গিরাইল, উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া, তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৭

৯৮. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আজাহার আলি, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৭

৯৯. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. লফিজ উদ্দীন, পিতা : নজের কাজী, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

১০০. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: নাজের আলী, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

১০১. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আজাহার আলি, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৭

১০২. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. লফিজ উদ্দীন, পিতা : নজের কাজী, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

১০৩. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: রজিব উদ্দিন, পিতা : আসতউল্লাহ, , গ্রাম: জয়তুল, উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আব্দুস সামাদ, পিতা: আব্বাস মন্ডল, গ্রাম: জয়তুল, উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া, ২৫ জুলাই ২০১৭

১০৪. http://kahaloo.bogra.gov.bd

১০৫. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. কায়েস উদ্দিন (৮৮), পিতা : মহোরআলী প্রমানিক, গ্রাম : মির্জাপুর, ইউনিয়ন : ভট্টরা, থানা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আনোয়ার হোসেন রানা, সম্পাদক: সাপ্তাহিক আজকের তাজা খবর, উপজেলা: নন্দীগ্রাম, জেলা: বগুড়া, তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৭

১০৬. *ঐ*

১০৭. *http://www.dhakatimes24.com/2016/12/13/11806*

১০৮. *http://www.snn24.com/sn-4790*

১০৯. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

১১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

১১১. সংগ্রহ : মালদা গণকবর স্মৃতিসৌধ

১১২. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আলহাজ্ব মো. হাবিবুর রহমান (৬৭), পেশা : ব্যবসায়ী, লিচুতলা, বগুড়া সদর, বগুড়া, তারিখ : ২১ জুলাই ২০১৭

১১৩. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: ওবায়দুর রহমান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শেরপুর, জেলা: বগুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : সাতমাথা পোস্ট অফিসের সামনে, তারিখ : ২৭ জুন ২০১৭

১১৪. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫

১১৫. সংগৃহিত : দড়িমুকুন্দ চব্বিশ শহিদিয়া কবরস্থান

১১৬. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

১১৭. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আব্দুল বারী, শিবগঞ্জ থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, বগুড়া, তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭

১১৮. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. সাইফুল ইসলাম প্রামাণিক (৬৫), পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : মালাহার, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ৩০ আগস্ট ২০১৭

১১৯. http://bn.banglapedia.org/index.php?

১২০. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আব্দুল হামিদ (৫৮), পেশা : কৃষক, গ্রাম : দহরপুর, ইউনিয়ন : দহরপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

১২১. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: বজলুর প্রামাণিক (৫৮), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শলিগ্রোম, ইউনিয়ন : ছাতিনগ্রাম, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

বাংলা ট্রিবিউন, মার্চ ০৫, ২০১৭

১২২. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. আবু তাহের (৬৬), অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী ও মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : ধনতলা, ইউনিয়ন : নশরতপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

১২৩. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আব্দুল হামিদ (৫৮), পেশা : কৃষক, গ্রাম : দহরপুর, ইউনিয়ন : দহরপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

১২৪. http://bn.banglapedia.org/index.php?

১২৫. মামুন রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

১২৬. http://bn.banglapedia.org/index.php?

১২৭. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

১২৮. *ঐ*

১২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ ডিসেম্বর ২০১২

১৩০. http://bn.banglapedia.org/index.php?

১৩১. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

১৩২. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. সিরাজুল ইসলাম (৭০), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শাহবাজপুর, ইউনিয়ন : ঘোরাপীর, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

১৩৩. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. সিরাজুল ইসলাম (৭০), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শাহবাজপুর, ইউনিয়ন : ঘোরাপীর, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

১৩৪. http://bn.banglapedia.org/index.php?

১৩৫. *ঐ*

১৩৬. নূরজাহান বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়া তেঁতুলতলা এলাকার আজিজার রহমান তোতার দ্বিতীয় স্ত্রী ।

১৩৭. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: অ্যাড. মকবুল হোসেন মুকুল, পিতার নাম: মৃত সৈয়দ আলী মন্ডল, পেশা: আইনজীবী, মহলা: বাদুরতলা, ডাকঘর/ উপজেলা: বগুড়া, জেলা: বগুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : বগুড়া কোর্ট, ২৫ মার্চ ২০১৪

১৩৮. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

১৩৯. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: অ্যাড. রেজাউল করিম মন্টু, পিতার নাম: মৃত ইমারত আলী, পেশা: আইনজীবী, সাক্ষৎকার গ্রহণের স্থান: জলেশ্বরীতলা, বগুড়া, ২৫ মার্চ ২০১৪

১৪০. http://www.sadar.bogra.gov.bd/site/page/ae79

১৪১. *প্রথম আলো*, ১১ ডিসেম্বর ২০১৬

১৪২. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৮

১৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬

১৪৩(ক) আকবর আহমদ www.facebook.com/akar1999 20 Feb 2017

১৪৪. এম এ হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৩

অ্যাড. রেজাউল করিম মন্টু, *প্রাগুক্ত*

১৪৫. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

১৪৬. এম এ হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৩

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯

১৪৭. http://www.sadar.bogra.gov.bd/site/page/ae79

১৪৮. সংগ্রহ : আহম্মেদ শরীফ, স্মৃতিস্তম্ভ, আজিজুল হক কলেজ (পুরাতন শাখা), ফুলবাড়ি, বগুড়া

১৪৯. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আব্দুল কাদের , উপজেলা কমান্ডার: বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৭ মে ২০১৪

১৫০. আব্দুল কাদের, *প্রাগুক্ত*

১৫১. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪

১৫২. হোসনে আরা, '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনির নির্যাতন ও গণহত্যা : পরিপ্রেক্ষিত বগুড়া', *Clio*, Jahangirnagar University Journal of the Department of History, Vol.XXXII, June 2015, P. 67

১৫৩. এম এ হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১-২৬২

১৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১

১৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯, ৭০-৭১

১৫৬. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আলহাজ্ব মো. হাবিবুর রহমান (৬৭), পেশা : ব্যবসায়ী, লিচুতলা, বগুড়া সদর, বগুড়া, তারিখ : ২১ জুলাই ২০১৭

১৫৭. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

১৫৮. http://bn.banglapedia.org

১৫৯. সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩২১

১৬০. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. হামিদ আলী (৬৬), পিতা : মনুশাহ, গ্রাম: সরলপুর, ইউনিয়ন : গোকুল, উপজেলা : বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

১৬১. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২

১৬২. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৮ ডিসেম্বর, ২০১৬

১৬৩. http://www.sadar.bogra.gov.bd/site/page/ae79

১৬৪. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

১৬৫. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. আবদুল মজিদ, উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডার, দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : নিজ বাসভবন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৬ মার্চ ২০১৪

১৬৬. এম এ হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯

১৬৭. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬

১৬৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৫

১৬৯. এম এ হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১

১৭০. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৫

১৭১. সেলিনা শিউলী, পৃ. ৫৩-৫৪

১৭২. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মোঃ লিয়াকত আলী, মুক্তিযোদ্ধা, মাঝিড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া, তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০১৭

১৭৩. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬

১৭৪. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫

১৭৫. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: হাশেম আলী মণ্ডল (৬০), বাগড়া কলোনী, কুমুদী, শেরপুর, তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৭

১৭৬. *http://sherpur.bogra.gov.bd/site/tourist_spot*

১৭৭. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: জোবেদা আক্তার (৬০), বাগড়া কলোনী, কুমুদী, শেরপুর, তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৭

১৭৮. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: হাশেম আলী মণ্ডল (৬০), বাগড়া কলোনী, কুমুদী, শেরপুর, তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৭

১৭৯. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম:ওবায়দুর রহমান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শেরপুর, জেলা: বগুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : সাতমাথা পোস্ট অফিসের সামনে, ২৭ মে ২০১৪

১৮০. http://www.banglanews24.com/national/news/bd/449462.details#3

১৮১. *ঐ*

১৮২. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (৬৫), পিতা : মৃত নূরুল ইসলাম মণ্ডল, মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : মালাহার, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

১৮৩. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আব্দুল হামিদ (৫৮), পেশা : কৃষক, গ্রাম : দহরপুর, ইউনিয়ন : দহরপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

১৮৪. সাক্ষাৎকার : হাজী মো: মোজাম্মেল হক (৬৭), অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : পূর্ব ডালম্বা, ইউনিয়ন : নশরতপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

১৮৫. উপজেলা : গবিন্দোগঞ্জ, জেলা : গাইবান্ধা

১৮৬. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. সিরাজুল ইসলাম (৭০), পেশা : কৃষক, গ্রাম :

শাহবাজপুর, ইউনিয়ন : ঘোরাপীর, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

১৮৭. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. সিরাজুল ইসলাম (৭০), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শাহবাজপুর, ইউনিয়ন : ঘোরাপীর, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

১৮৮. এম এ হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৩

১৮৯. *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪
http://www.kalerkantho.com/home/printnews/163146/2014-12-15

১৯০. এম এ হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২২

১৯১. *ঐ*

১৯২. http://www.sadar.bogra.gov.bd/site/page/ae79

১৯৩. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আলহাজ্ব মোঃ তোজাম্মেল হোসেন, বগুড়া শহর আওয়ামী লীগের ২০ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন সভাপতি, বয়স-প্রায় ৭৫, সাক্ষাৎকারের স্থান : নিজ বাসভবন, বগুড়া, তারিখ : ২৮ জুলাই ২০১৭

১৯৪. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২

১৯৫. *নিউজ নাইন*, প্রচার : ০৩ এপ্রিল ২০১৬
https://www.youtube.com/watch?v=IV8k767M4nA

১৯৬. http://ajkerpatrika.com/sarabangla/2015/12/07/61823

১৯৭. http://sadar.bogra.gov.bd/site/page/e80792d8-1ab0-11e7-8120-286ed488c766

১৯৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪

১৯৯. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মোঃ জালাল উদ্দীন, ধুনট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, ধুনট, বগুড়া, তারিখ: ৩০ মে ২০১৪

২০০. http://www.dainikamadershomoy.com/bangladesh/45769/

২০১. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মোঃ জালাল উদ্দীন, ধুনট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, ধুনট, বগুড়া, তারিখ: ৩০ মে ২০১৪

২০২. মো. আবদুল মজিদ, *প্রাগুক্ত* মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

২০৩. http://www.thedailystar.net/bangla

২০৪. মো. আবদুল মজিদ, *প্রাগুক্ত* মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

২০৫. http://www.thedailystar.net/bangla

২০৬. *ঐ*

২০৭. *ঐ*

২০৮. *ঐ*

২০৯. মো. আবদুল মজিদ, *প্রাগুক্ত*

২১০. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: হুমায়ন আলম চান্দু, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার গাবতলী থানা, গাবতলী, বগুড়া, তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৭

২১১. *প্রাগুক্ত*

২১২. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. আব্দুল বারি (৭০), পেশা : সাধুবাবা, গ্রাম : ঝাউপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, বগুড়া, তারিখ : ৩১ আগস্ট ২০১৭

২১৩. স্মৃতি স্তম্ভ থেকে সংগৃহিত

২১৪. *দৈনিক বণিক বার্তা*, মার্চ ২৫, ২০১৭

২১৫. *ঐ*

২১৬. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

২১৭. http://bn.banglapedia.org

২১৮. আব্দুল কাদের, *প্রাগুক্ত*

২১৯. http://sadar.bogra.gov.bd

২২০. সাক্ষাৎকার : মো. হেলাল উদ্দীন (৬০), পেশা : ব্যবসা, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর, বগুড়া, তারিখ : ২১ জুলাই ২০১৭

২২১. http://sadar.bogra.gov.bd

২২২. *প্রথম আলো*, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫

২২৩. সাক্ষাৎকার : মো. হেলাল উদ্দীন (৬০), পেশা : ব্যবসা, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর, বগুড়া, তারিখ : ২১ জুলাই ২০১৭

২২৪. http://sadar.bogra.gov.bd/site/top_banner/8df362b5-1ab1-11e7-8120-286ed488c766

২২৫. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আব্দুল কাদের , উপজেলা কমান্ডার: বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৭ জুলাই ২০১৭

২২৬. http://zuddhodolil.com

২২৭. *ঐ*

২২৮. *প্রথম আলো*, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫

২২৯. *প্রথম আলো*, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫

২৩০. http://www.sadar.bogra.gov.bd

২৩১. *প্রথম আলো*, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫

২৩২. http://www.sadar.bogra.gov.bd

২৩৩. *প্রথম আলো*, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫

২৩৪. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২

২৩৫. *প্রথম আলো*, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫

২৩৬. http://www.sadar.bogra.gov.bd

২৩৭. *ঐ*

২৩৮. মোঃ জালাল উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*

২৩৯. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬

সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

২৪০. *ঐ*

২৪১. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: লিয়াকত আলী, গ্রাম : বৃ-কুষ্টিয়া, আড়িয়াবাজার, শাজাহানপুর, তারিখ : ২৮ আগস্ট ২১০৭

২৪২. *প্রথম আলো*, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫

২৪৩. আবুল কাশেম ফকির, 'পাকিস্তানি সেনাদের ৪শ অস্ত্র দখল করি', *কালের কণ্ঠ*, ২২ মার্চ, ২০১৭

২৪৪. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (৬৫), পিতা : মৃত নূরুল ইসলাম মণ্ডল, মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : মালাহার, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

২৪৫. http://www.sadar.bogra.gov.bd

২৪৬. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ২৯৭

২৪৭. http://muktijuddho-bogra.blogspot.com/2015/11/blog-post.html

২৪৮. http://www.sadar.bogra.gov.bd

২৪৯. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. হামিদ আলী (৬৬), পিতা : মনুশাহ, গ্রাম: সরলপুর, ইউনিয়ন : গোকুল, উপজেলা : বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

২৫০. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২

২৫১. *ঐ*

২৫২. *বাংলা ট্রিবিউন*, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১৭

২৫৩. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ২৯৫

২৫৪. http://muktijuddho-bogra.blogspot.com/2015/11/blog-post_22.html

২৫৫. *অনাবিল সংবাদ*, ডিসেম্বর ১২, ২০১৫

২৫৬. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ২৪৩

২৫৭. *ঐ*, পৃ. ৩৩৪

২৫৮. *ঐ*, পৃ. ৩৮৯

২৫৯. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮

২৬০. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ৩৩২

২৬১. http://muktijuddho-bogra.blogspot.com/2015/11/blog-post_24.html

২৬২. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৬

২৬৩. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

২৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

২৬৫. মামুন রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

২৬৬. *ঐ*

২৬৭. *ঐ*

২৬৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

২৬৯. *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৯ মার্চ, ২০১৪

২৭০. http://bddistrict.info

২৭১. *ঐ*

২৭২. *ঐ*

২৭৩. সাঈদ বাহাদুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

২৭৪. মামুন সিদ্দিকী, 'কুমিল্লা ১৯৭১: গণহত্যা, গণকবর ও বধ্যভূমির পরিচয়', *স্থানীয় ইতিহাস*, সংখ্যা ১৪, ২০১৫, পৃ. ১৪৯

২৭৫. আহম্মেদ শরীফ, 'গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর ১৯৭১: পরিপ্রেক্ষিত নীলফামারী', *স্থানীয় ইতিহাস*, সংখ্যা ১৪, ২০১৫, পৃ. ১২০-১৩৩

২৭৬. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

পরিশিষ্ট ১

মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের অসম্পূর্ণ নামের তালিকা

বগুড়া সদর উপজেলা

১. হাবিলদার রহিম উদ্দিন (বিডিআর), পিতা : মৃত নিদানু শেখ, সেউজগাড়ি, বগুড়া সদর
২. মোসলেম উদ্দিন (পুলিশ), পিতা : পরেশউদ্দিন শেখ, সেউজগাড়ি, বগুড়া সদর
৩. আব্দুস সামাদ, পিতা : মৃত মোজাম্মেল হক, সুলতানগঞ্জপাড়া, বগুড়া সদর
৪. মাসুদুল আলম খান চান্দু, পিতা : মৃত আঃ খালেক খান, ঠনঠনিয়া, বগুড়া সদর
৫. খন্দকার আবু সুফিয়ান, পিতা : সাদত আলী খন্দকার, নিশিন্দারা, বগুড়া সদর
৬. আনোয়ারুল হক আজাদ, পিতা : মো. আলী আযম মিয়া, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া সদর[১]
৭. সৈয়দ কেরামত আলী গোরা, পিতা : মো. আলী আযম মিয়া, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া সদর
৮. আবু সুফিয়ান, বগুড়া সদর[২]
৯. আমিনুল কুদ্দুস বুলবুল, পিতা : মো. সামসুউদ্দিন আহমেদ, কাটনারপাড়া,বগুড়া সদর
১০. মোতাছিম বিল হক, পিতা : মো. মাইদুল হক, কাটনারপাড়া, বগুড়া সদর
১১. আবুল কাশেম, পিতা : মৃত আব্দুর রহমান মন্ডল, চকসুত্রাপুর, বগুড়া সদর
১২. আবুল হোসেন পশারী, পিতা : মৃত বাহার পশারী, সুত্রাপুর, বগুড়া সদর
১৩. মোস্তফা পাইকার খোকন, পিতা : মৃত মোজাম পাইকার, মালতিনগর, বগুড়া সদর
১৪. আজিজার চাঁন, পিতা : মৃত নাজিমউদ্দিন ফকির, সুত্রাপুর, বগুড়া সদর
১৫. হেলালুর রহমান চিশতি, পিতা : মৃত মুনসুর রহমান চিশতি, রহমান নগর, বগুড়া সদর
১৬. মোস্তাফিজুর রহমান চুন্নু, পিতা : মৃত ফজলার রহমান, মালতিনগর, বগুড়া সদর
১৭. ছাইফুল ইসলাম, পিতা : আব্দুল গনি মন্ডল, শহীদনগর, বগুড়া সদর
১৮. আব্দুল জব্বার, পিতা : মৃত মহরম আলী, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া সদর

১৯. সিরাজ উদ্দিন, পিতা : মৃত ছিকাতউদ্দিন, সুত্রাপুর, বগুড়া সদর
২০. গঙ্গারাম চৌধুরী (পুলিশ), পিতা : পরবেশ রায় চৌধুরী, মালতিনগর, বগুড়া সদর
২১. সুনীল কুমার মোহন্ত, পিতা : অজ্ঞাত, সুত্রাপুর, বগুড়া সদর
২২. আবুল কাশেম, পিতা : মৃত সাধু প্রামানিক, মথুরা, নামুজা, বগুড়া সদর
২৩. আব্দুস সামাদ প্রাং, পিতা : সমতুল্যা প্রামানিক, পাল্লাপাড়া, নামুজা, বগুড়া সদর
২৪. মাহফুজার রহমান, পিতা : আলহাজ্ব বজলার রহমান, সাতশিমুলিয়া, বগুড়া সদর, বগুড়া
২৫. সদন মোহন কর্মকার, পিতা : কালিপদ কর্মকার, আশাকোলা, বগুড়া সদর, বগুড়া
২৬. কাবুল আহমেদ, পিতা : মৃত গোলাম রসুল, ঠনঠনিয়া, বগুড়া সদর
২৭. আব্দুস সোবাহান গনি, পিতা : রিয়াজ খান, নামাজগড়, বগুড়া সদর
২৮. দোলন, পিতা : অজ্ঞাত, মালতিনগর, বগুড়া সদর
২৯. হান্নান, পিতা : মৃত ওহি উদ্দিন পশারী, ঠনঠনিয়া শহীদনগর, বগুড়া সদর
৩০. মান্নান, পিতা : মৃত ওহিউদ্দিন পশারী, ঠনঠনিয়া শহীদনগর, বগুড়া সদর
৩১. খন্দকার মোহাম্মদ জামাল, পিতা : মৃত কে এফ হাসান, চকসুত্রাপুর, বগুড়া সদর
৩২. মোফাজ্জল হোসেন আবুল, পিতা : মৃত গেদু জিলাদার, ঠনঠনিয়া, বগুড়া সদর
৩৩. রোস্তম আলী, পিতা : মৃত মোকছেদ আলী ফকির, আটাপাড়া, বগুড়া সদর
৩৪. শফিউদ্দিন আহম্মেদ, পিতা : মৃত সমতুল্য মন্ডল, কাটনারপাড়া, বগুড়া সদর
৩৫. রমজান আলী, পিতা : মৃত নায়েম উদ্দিন, সুত্রাপুর, বগুড়া সদর
৩৬. আবু তালেব, পিতা : মৃত ছমির উদ্দিন, মালতিনগর, বগুড়া সদর
৩৭. সোলায়মান আলী, পিতা : বাদশা খলিফা, বৃন্দাবনপাড়া, বগুড়া সদর
৩৮. করিম বেপারি, পিতা : মৃত জামিল, জামিল মাদ্রাসার গেট, বগুড়া সদর
৩৯. তবিবর রহমান, পিতা : মৃত মালেক সরকার, উত্তর চেলোপাড়া, বগুড়া সদর
৪০. তারেক, বগুড়া সদর
৪১. সাইফুল, বগুড়া সদর
৪২. বেলায়েত হোসেন, রামশহর, গোকুল, বগুড়া সদর
৪৩. দবির উদ্দীন, রামশহর, গোকুল, বগুড়া সদর
৪৪. হাবিবুর রহমান, রামশহর, গোকুল, বগুড়া সদর
৪৫. আব্দুস সালাম লালু, রামশহর, গোকুল, বগুড়া সদর
৪৬. খলিলুর রহমান, রামশহর, গোকুল, বগুড়া সদর
৪৭. জাহিদুর রহমান মুকুল, রামশহর, গোকুল, বগুড়া সদর
৪৮. আসগর আলী, রামশহর, গোকুল, বগুড়া সদর

৪৯. মজিবুর রহমান, রামশহর, গোকুল, বগুড়া সদর
৫০. হায়দার আলী, রামশহর, গোকুল, বগুড়া সদর
৫১. বুলু মিয়া, রামশহর, গোকুল, বগুড়া সদর
৫২. মোকসেদ আলী, রামশহর, গোকুল, বগুড়া সদর[৩]
৫৩. সামসুদ্দিন সরকার (সিআইবি), পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৫৪. আঃ কাদের (এএসআই), পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৫৫. গুলজার হোসেন (কনস্টেবল), পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৫৬. খোদা বক্স, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৫৭. চান মিয়া, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৫৮. আব্দুল করিম, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৫৯. ইসমাইল হোসেন, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৬০. খোন্দকার আব্দুল আজিজ, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৬১. হারুনার রশীদ, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৬২. আনোয়ার সরকার, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৬৩. খায়রুল বাশার, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৬৪. ইউসুফ খান, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৬৫. আব্দুর রহিম, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৬৬. মোসলেম উদ্দীন, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৬৭. ইসহাক শরীফ, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৬৮. মশিউর রহমান, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৬৯. সমির উদ্দীন, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৭০. মনির উদ্দীন আহমেদ, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৭১. সুশীল মোহন বড়ুয়া, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৭২. আব্দুল মান্নান, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৭৩. আব্দুল করিম, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর
৭৪. নাজিমুদ্দিন, পুলিশ লাইন, বগুড়া সদর[৪]
৭৫. শহিদ হাফিজার রহমান, গ্রাম : সরলপুর, ইউ : গোকুল উপজেলা : বগুড়া সদর
৭৬. শহিদ বাবুল, গ্রাম : সরলপুর, ইউ : গোকুল উপজেলা : বগুড়া সদর[৫]
৭৭. ঠিকাদার হাফিজার, শিববাটি, বগুড়া সদর
৭৮. খোদেজা খাতুন, শিববাটি, বগুড়া সদর
৭৯. প্রকৌশলী বদরুল করিম, শিববাটি, বগুড়া সদর
৮০. টুটুল, শিববাটি, বগুড়া সদর

৮১. সেকেন্দার আলী, শিববাটি, বগুড়া সদর
৮২. আনজুমান আরা, শিববাটি, বগুড়া সদর
৮৩. ঠিকাদার হাফিজারের গৃহপরিচারিকা একটি শিশু, শিববাটি, বগুড়া সদর[৬]
৮৪. সুন্দর সাধু, বগুড়া সদর
৮৫. মঙ্গল সাধু, বগুড়া সদর
৮৬. মুনেন্দ্রনাথ সরকার, বগুড়া সদর[৭]
৮৭. শহিদ নাসির উদ্দীন প্রাং, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৮৮. নূর আলম, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৮৯. আব্দুল জব্বার মোল্লা, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৯০. শাজাহান আলী ফকির, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৯১. অমেদ আলী খান, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৯২. মোজাফফর আলী মন্ডল, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৯৩. আমজাদ হোসেন ধলু, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৯৪. ফয়েজ উদ্দীন, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৯৫. তমেজ আলী মন্ডল, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৯৬. আব্দুর রহমান শেখ, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৯৭. নুরুল ইসলাম, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৯৮. জয়েন উদ্দীন শেখ, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
৯৯. ইসমাইল হোসেন, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১০০. বুদু মিয়া, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১০১. শুটকু ফকির, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১০২. রোস্তম আলী প্রাং, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১০৩. নজুর আলী, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১০৪. সবেদ আলী মোল্লা, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১০৫. হাবিবুর রহমান প্রাং, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১০৬. জাহিদুর রহমান খন্দকার, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১০৭. আকবর আলী মোল্লা, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১০৮. ইনসান আলী মৃধা, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১০৯. মোকসেদ উদ্দীন, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১১০. মমতাজ উদ্দীন খন্দকার, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১১১. হাবিবুর রহমান মুন্সি, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর

১১২. আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১১৩. শহিদ কসিম উদ্দীন, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১১৪. বশারতুল্লাহ খা (বুদা খা), ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১১৫. শহিদ মুকুল ফকির, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১১৬. মোহাম্মদ আলী, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১১৮. ফজলার রহমান, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১১৯. আফজাল পাইকার, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর
১২০. সেকেন্দার আলী, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর [৮]
১২১. আব্দুস শহিদ, পিতা : আলহাজ্ব হানিফ উদ্দিন, চকসূত্রাপুর, বগুড়া সদর
১২২. আব্দুল কাদের, পিতা : আলহাজ্ব হানিফ উদ্দিন, চকসূত্রাপুর, বগুড়া সদর
১২৩. আব্দুস সাত্তার, পিতা : আলহাজ্ব হানিফ উদ্দিন, চকসূত্রাপুর, বগুড়া সদর
১২৪. আব্দুল গনি, চকসূত্রাপুর, বগুড়া সদর
১২৫. আব্দুল মতিন সুজা, পিতা : আব্দুল গনি, চকসূত্রাপুর, বগুড়া সদর
১২৬. মেহের আলী শেখ বাচ্চা, চকসূত্রাপুর, বগুড়া সদর[৯]
১২৭. ইসরাইল হোসেন বুলু, পিতা : মৃত কমরউদ্দিন, নারুলী মধ্যপাড়া, বগুড়া সদর
১২৮. শরীফ উদ্দিন প্রাং, পিতা : মৃত বুদা প্রাং, নারুলী মধ্যপাড়া, বগুড়া সদর
১২৯. বেলায়েত হোসেন, নারুলী মধ্যপাড়া, বগুড়া সদর
১৩০. জসিম উদ্দিন, নারুলী মধ্যপাড়া, বগুড়া সদর
১৩১. ছফের আলী শেখ, নারুলী মধ্যপাড়া, বগুড়া সদর
১৩২. সরাফত আলী শেখ, নারুলী মধ্যপাড়া, বগুড়া সদর
১৩৩. আব্দুর রহিম, চকআকাশ তারা, বগুড়া সদর
১৩৪. শরীফ, চেলোপাড়া, বটতলা, বগুড়া সদর
১৩৫. বীরেন্দ্র নাথ দাস, উত্তর চেলোপাড়া, বগুড়া সদর
১৩৬. গোপাহার আলী, নারুলী, বগুড়া সদর
১৩৭. মেহেরাজ উদ্দিন, পিতা : মৃত বসির উদ্দিন, নারুলী, বগুড়া সদর।[১০]
১৩৮. মোঃ মমতাজুর রহমান, বগুড়া সদরের বাসিন্দা। তিনি আযিযুল হক কলেজের অফিস সহকারি হিসেবে কর্মরত ছিলে। তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে শহিদ হন।[১১]

১৩৯. **বুলু**

বুলু একজন মুক্তিযোদ্ধা। বুলু খুব লম্বা ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিল। বগুড়া সদর থানা বাগানবাড়ি তাল পুকুর এলাকায় তার বাড়ি। সাধারণ মানুষকে নিয়ে তিনি পাকিস্তানবিরোধী মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের সাতমাথার দিকে

অগ্রসর হতে থাকে। মিছিলটি ঠেকানোর জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে। বুলুসহ এলাকার অনেক মানুষ শহিদ হন।[১২]

১৪০. **মো. তোতা মিয়া সরকার**

মো. তোতা মিয়া সরকার একজন মুক্তিযোদ্ধা। পিতা ভোলা মিয়া সরকার। বগুড়া জেলার ঠেংগামারা অঞ্চলে তাঁর বাড়ি। তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহিন হন। তোতা মিয়া সরকার বগুড়া-র সদর থানায় যুদ্ধ করেন। ঠেংগামারায় তাঁর সমাধিস্থল।[১৩]

১৪১. **মো. টিএম আইয়ুব টিটু**

টিটু বগুড়া জেলার মালতীনগরের বাসিন্দা। পিতা মো. আশমুজ্জামান। তিনি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানি হানাদারদের অভিযানের সময় বগুড়ায় শহিদ হন।[১৪] মালতিনগরেই তাঁর সমাধিস্থল।[১৫]

১৪২. **মো. আব্দুল আমিন (হিটলু)**

মো. আব্দুল আমিন (হিটলু) একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি যুদ্ধে শহিদ হন। তাঁর পিতার নাম মো. মোজাম্মেল হক। বগুড়া জেলার জুলেশ্বরীতলা গ্রামের সদর থানায় তাঁর বাড়ি।[১৬] হিটলুকে পাকিস্তানি বাহিনি সঙ্গে করে নিয়ে যায়। হিটলুর লাশ তারা গুম করে।[১৭]

১৪৩. **মো. আমিনুল কুদ্দুস (বুলবুল)**

মো. আমিনুল কুদ্দুস (বুলবুল) একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। বগুড়া জেলার সদর থানায় তাঁর বাড়ি। তাঁর পিতার নাম সামমুছ আহমেদ। বগুড়া সদর এলাকায় তিনি যুদ্ধে করেন। তাঁর সমাধিস্থল বগুড়া জেলার কাহালু এলাকা।[১৮]

১৪৪. **মো. মুস্তাফিজুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা**

মো. মুস্তাফিজুর রহমান একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি যুদ্ধে শহিদ হন। তাঁর পিতা ফজলুর রহমান। বগুড়া জেলার সদর থানার জলেশ্বরীতলা গ্রামের তাঁর বাড়ি। তিনি বগুড়া সদর থানায় যুদ্ধ করেন। রহমাননগর বগুড়ায় তাঁর সমাধিস্থল।[১৯]

১৪৫. **মো. হেলালুর রহমান চিস্তি, মুক্তিযোদ্ধা**

মো. হেলালুর রহমান চিস্তি একজন মুক্তিযোদ্ধা। পিতা : মো. শুনছুর রহমান চিস্তি। বগুড়া জেলায় তাঁর বাড়ি। তিনি বগুড়া সদর থানায় যুদ্ধে শহিদ হন। বগুড়া কলোনি স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন স্থানে মো. হেলালুর রহমান চিস্তি'র সমাধিস্থল।[২০]

১৪৬. মোজাম্মেল হক, ডা.

ডা. মোজাম্মেল হক ছিলেন বগুড়া জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজসেবী। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের (অস্থায়ী) শ্রম অধিদপ্তরে কাজ করতেন। ২৭ মে তাঁকে ঘাতক দালাল রাজাকার চক্রের সহায়তায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁর চেম্বার থেকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।[২১]

১৪৭. হাফিজুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা

হাফিজুর রহমান একজন মুক্তিযোদ্ধা। বগুড়া জেলার সদর থানায় তাঁর বাড়ি। গোকুলের রেইড যুদ্ধে শহিদ হন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[২২]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

আদমদীঘি উপজেলা

১. জালাল হোসেন, গ্রাম : ছাতনী, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

২. মহাতাব উদ্দীন, গ্রাম : ঢেকড়া, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৩. আখের আলী, গ্রাম : কেল্লাপাড়া, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৪. দেওয়ান আব্দুল মজিদ, ইয়ার্ড কলোনী, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৫. ডাঃ কিসমতের স্ত্রী, যোগীপুকুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৬. ডাঃ কিসমতের শ্বাশুড়ী, যোগীপুকুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৭. শহিদ জসিম উদ্দিন, পিতা : মৃত ইশারত মোলা, গ্রাম : কাশিমালা, ইউনিয়ন : আদমদীঘি, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৮. শহিদ খয়বর প্রাং, পিতা : মৃত রহিমুল্লা, গ্রাম : কাশিমালা, ইউনিয়ন : আদমদীঘি, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৯. শহিদ মমতাজ সাখিদার, পিতা : মৃত ফুলচাঁদ সাখিদার, গ্রাম : কাশিমালা, ইউনিয়ন : আদমদীঘি, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

১০. শহিদ বর্ণিজ প্রাং, পিতা : মৃত রজব আলী, গ্রাম : কাশিমালা, ইউনিয়ন : আদমদীঘি, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

১১. শহিদ বিলায়েত প্রাং, পিতা : মৃত মুমিন প্রাং, গ্রাম : কাশিমালা, ইউনিয়ন : আদমদীঘি, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

১২. শহিদ গহির প্রাং পিতা : মৃত সারিয়া প্রাং, গ্রাম : কাশিমালা, ইউনিয়ন : আদমদীঘি, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

১৩. শহিদ ইয়াছিন প্রাং, পিতা : মৃত রহমতুল্লা, গ্রাম : কাশিমালা, ইউনিয়ন : আদমদীঘি, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

১৪. শহিদ আমজাদ হোসেন, পিতা : মৃত হাজেম মোলা, গ্রাম : কাশিমালা, ইউনিয়ন : আদমদীঘি, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

১৫. শহিদ লায়েব সরদার, পিতা : মৃত বয়তুল্লা, গ্রাম : প্রসাদখালি, ইউনিয়ন : আদমদীঘি, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া[২৩]

১৬. শহিদ আজিজার রহমান, পিতা : মৃত উমির উদ্দীন শাহ, গ্রাম : মালশন, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

১৭. আব্দুল জলিল জোয়ারদার, পিতা : মৃত মনসের জোয়ারদার, গ্রাম : সান্দিড়া, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

১৮. আশরাফ আলি, পিতা : মোঃ তয়েজ উদ্দীন, গ্রাম : পোঁওতা, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

১৯. সূজিত চন্দ্র, পিতা : অজ্ঞাত, গ্রামঃ মধূপুর, ময়মনসিংহ, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

২০. মো. রহিমুদ্দীন, পিতা : মৃত দশরত প্রামানিক, গ্রাম : দত্তবাড়িয়া, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

২১. আব্দুল লতিফ, পিতা : মৃত জাহের আলী, গ্রাম : পুসিন্দা, ইউনিয়ন : নশরতপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

২২. আজিজার রহমান, পিতা : আলহাজ্ব বয়েজ উদ্দীন, গ্রাম : চাটঘোইল, ইউনিয়ন : নশরতপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

২৩. আক্কাস আলী, পিতা : মৃত আলহাজ্ব আশকর আলী, গ্রাম : মরইল উত্তরপাড়া, ইউনিয়ন : নশরতপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া[২৪]

২৪. জালাল উদ্দীন, পিতা : আলহাজ্ব কামাল উদ্দীন, গ্রাম : লক্ষিপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

২৫. ইব্রাহিম আলী, পিতা : মৃত জহির আকন্দ, গ্রাম : মটপুকুরিয়া, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

২৬. নজরুল ইসলাম, পিতা : মৃত কছির ফকির, গ্রাম : অন্তাহার, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

২৭. আশরাফ উদ্দীন, পিতা : মৃত লালচাঁন, গ্রাম : অন্তাহার, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

২৮. আব্দুল মজিদ, পিতা : মৃত ছবেদ আলী, গ্রাম : অন্তাহার, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

২৯. আলতাফ হোসেন, পিতা : শমসের আলী মন্ডল, গ্রাম : চকসোনার, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৩০. আব্দুল জলিল, পিতা : মৃত ফজের আলী, গ্রাম : কোমারপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৩১. আব্দুস সাত্তার প্রাং, পিতা : মৃত নীলচাঁদ প্রামানিক, গ্রাম : ডহরপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৩২. মোজাম্মেল হক, পিতা : ইশারত প্রামানিক, গ্রাম : কাশিমালা, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৩৩. আমজাদ হোসেন, পিতা : মৃত আরজ আলী, গ্রাম : জোড়পুকুরিয়া, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৩৪. শরিফ উদ্দীন, পিতা : মৃত ছমির উদ্দীন, গ্রাম : শিবপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৩৫. পুলক কুমার বিশ্বাস, পিতা : জয়সকিন্দ বিশ্বাস, গ্রাম : তালশন, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৩৬. মনসরুল হক টুলু, পিতা : মৃত তবিবর রহমান, গ্রাম : কাঞ্চনপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৩৭. আব্দুস সাত্তার, পিতা : মৃত মোস্তাকিন, গ্রাম : কাঞ্চনপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৩৮. জালাল উদ্দিন, মোরগ্রাম/গোরগ্রাম, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া [২৫]

৩৯. হেমন্ত বসাক, গ্রাম : ছাতিয়ান, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৪০. রুপভান, গ্রাম : ছাতিয়ান, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৪১. সমিনা বিবি, গ্রাম : ছাতিয়ান, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৪২. সুমল বসাক, গ্রাম : ছাতিয়ান, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া

৪৩. চাঁন মোহাম্মাদ, গ্রাম : ছাতিয়ান, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া [২৬]

৪৪. এস. এম. আসলাম-উদ-দেলাল

বগুড়া জেলার ঢেকরা গ্রাম (ডাকঘর : ছাতনী, উপজেলা : আদমদিঘী) ১৯৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এস. এম. আবুবকর সিদ্দিক। আসলাম-উদ-দেলাল সৈয়দপুর টেকনিক্যাল কলেজে পড়ালেখা করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে চলে যান এবং শিলিগুড়ি কেন্দ্রে অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ৭ নং সেক্টরে যোগদান করেন। সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল কাজী নূরুজ্জামান ও গ্রুপ কমান্ডার এ. কে. এম ফজলুল করিমের অধীনে এলকার বিভিন্ন স্থানে সংঘটি যুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালের ৪ অক্টোবর ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা কালুপাড়া সীমান্ত দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল। পথিমধ্যে আকস্মিকভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ চালায়, ফলে ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে শত্রুসেনার গুলিতে এস. এম. আসলাম-উদ-দেলাল শহিদ হন।[২৭]

৪৫. বিনয় ভূষণ সিংহ

বিনয় ভূষণ সিংহের জন্ম বগুড়ার আদমদীঘিতে ২ জানুয়ারি ১৯৩১। পিতা : বনওয়ারী লাল সিংহ; মাতার নাম রাধা কমোলিনী সিংহ। তিনি ৫ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে প্রথম। আদমদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আদমদীঘি উচ্চ বিদ্যালয় ও বগুড়া মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ। ১৯৭১ সালে ছিলেন বিবাহিত ও ২ পুত্র, ৩ ৩ কন্যার জনক। ১৯৫১ সারে বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া থানায় এ.এস.এই পদে যোগদান; বৃহত্তর পাবনা জেলার উল্লাপাড়া থানায় এস.আই পদে উন্নীত; কর্মজীবনে বেলকুচি, শাহজাদপুর, বেড়া, চাটমোহর থানা, পাবনা পুলি কোর্টে দায়িত্ব পালন; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পাবনা পুলিশ লাইনে (রিজার্ভ) এস আই পদে কর্মরত। ২৬ মার্চ পাবনা পুলিশ লাইনে পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে বামহাতে গুলিবিদ্ধ; ২৪ এপ্রিল পাবনা জেলার চাটমোহর থানার নেংড়ী গ্রামে শাহাদতবরণ এবং উক্ত গ্রামের শ্মশানে সামাজিক ধর্মীয় প্রথা অনুসারে সৎকারকরণ।[২৮]

৪৬. সুজিত, মুক্তিযোদ্ধা

সুজিত বগুড়া জেলার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বর সান্তাহার যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি বিনিময়ের সময় শহিদ হন। তার স্মরণে যুদ্ধের পর সান্তাহার রেলস্টেশনের পাশের রেলগেটের নামকরণ করা হয়ে সুজিত রেলস্টেশন।[২৯]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

ধুনট উপজেলা

১. জহির উদ্দিন, গ্রাম : ভরনশাহী, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া
২. মোস্তাফিজুর রহমান, গ্রাম : কান্তনগর, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া
৩. জিললুর রহমান, গ্রাম : মাজবাড়ি, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া
৪. ফরহাদ আলী, গ্রাম : মাজবাড়ি, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া
৫. পর্বত আলী, গ্রাম : মাজবাড়ি, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া
৬. আব্দুল লতিফ, গ্রাম : চাঁন্দারপাড়া, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া
৭. নূরুল ইসলাম, গ্রাম : শিয়ালী, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া [৩০]
৮. নয়া মিয়া, গ্রাম : কান্তনগর, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া [৩১]
৯. মাধাইচন্দ্র, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া
১০. হারান প্রামানিক, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া [৩২]

১১. আব্দুর রউফ মল্লিক

আব্দুর রউফ মল্লিক জন্ম বগুড়ার ধুনটের পীরহাটি গ্রামে, ৫ জানুয়ারি ১৯৩১। পিতার নাম আব্দুর রাজ্জাক মল্লিক, মাতার নাম রেজিনা খাতুন। তিনি ৪ ভাই, ১ বোনের মধ্যে প্রথম। নাকুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গান্ধাইল মহিনর স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ। ১৯৭১ সালে ছিলেন বিবাহিত ও ৩ পুত্র, ১ কন্যার জনক। ১৯৫৫ সালে কনস্টেবল পড়ে বগুড়া পুলিশ লাইনে যোগদান; প্রশিক্ষণ শেষে রাজশাহী জেলায় নিযুক্তি; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহী গোদাগাড়ি থানায় কর্মরত; কনস্টেবল নং-৪০৯। ২১ এপ্রিল গোদাগাড়ি থানা এলাকা থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বন্দি; রাজশাহী শহরের পাশে পদ্মা নদীর তীরে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে শাহাদৎবরণ; তার লাশের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। [৩৩]

১২. মো. ওসমান গণি

মো. ওসমান গণি একজন মুক্তিযোদ্ধা। পিতা আয়েজ উদ্দিন। তিনি বগুড়ার ধুনট থানার ভাণ্ডার বাড়ি গ্রামে বাসিন্দা। ধুনট রেইডে ওসমান গণি শহিদ হন। ভাণ্ডারবাড়ি গ্রামে তাঁর সমাধিস্থল। [৩৪]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

দুপচাঁচিয়া উপজেলা

১. নিজাম উদ্দিন, পিতা : মৃত হানিফ উদ্দিন, ইউনিয়ন : গোবিন্দপুর, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া। শহিদ নিজাম উদ্দিন আমষট্ট রাস্তায় পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধের পর তাদের হাতে ধরা পরেন। রাজাকাররা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

২. নজরুল ইসলাম, পিতা : মৃত নজাবত আলী, গ্রাম : ডিমশহর, ইউনিয়ন : উপজেলার সদর ইউনিয়ন, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া। তিনি আক্কেলপুর থানায় পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হন।

৩. মুনসুর রহমান, পিতা : মৃত আব্বাছ আলী মন্ডল, গ্রাম : বেলঘরিয়া, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া। তিনি কাহালুর দেওগ্রামের নিহত হন।

৪. মকবুল হোসেন, পিতা : মৃত গমির উদ্দিন, গ্রাম : পালিমহেশপুর, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া। মকবুল হোসেন ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী। তিনি পেশায় ছিলেন একজন কৃষক। মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিন ধান ক্ষেতে কাজ করছিলেন। ঠিক সেই সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তাদের ওপর আক্রমণ করে। মকবুল হোসেন তার হাতে থাকা একটি লাঠি দিয়ে পাকিস্তানি একজন সৈন্যকে আঘাত করলে সাথে সাথে ঐ সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। এরপর অন্য এক পাকিস্তানি সৈন্য তাকে গুলি করে হত্যা করে।

৫. শাহাদত হোসেন, পিতা : মৃত লায়েব আলী, গ্রাম : পালিমহেশপুর, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া। তিনি নওগাঁর আত্রাই থানায় পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত হন।

৬. গোলাম মোস্তফা ফকির (সেনা সদস্য), পিতা : মৃত মেছের আলী, গ্রাম : পাঁচথিতা, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া। তিনি মুক্তিযুদ্ধে যাবার পর আর তাঁর কোনো খোঁজ মিলেনি।

৭. রবিয়া মন্ডল, পিতা : শরবদী মন্ডল, গ্রাম: কেউৎ, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া

৮. মকবুল মন্ডল, পিতা : মরিয়া মন্ডল, গ্রাম: কেউৎ, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া

৯. আবদুস সালাম, পিতা : রবিয়া মন্ডল, গ্রাম: কেউৎ, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া

১০. তছলিম উদ্দিন, পিতা : তছির উদ্দিন, গ্রাম: কুড়াহার, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া।[৩৫]

১১. মন্মথ চন্দ্র কুণ্ডু, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

১২. যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ওরফে ক্ষিতিশ চন্দ্র চৌধুরি, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া[৩৬]

১৩. মন্মথ কণ্ডু, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

১৪. দূর্গা কুণ্ডু, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

১৪. কালাচাঁদ কুণ্ডু, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

১৫. সন্তোষ কুণ্ডু, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

১৬. কানাইলাল পোদ্দার, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

১৭. ব্রজমোহন সাহা, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

১৮. কাকলী, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

১৯. তহিরউদ্দিন শাহ, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

২০. সতীশ চন্দ্র বসাক, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

২১. শরৎ মজুমদার, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

২২. অক্ষয় কুণ্ডু, কুণ্ডুপাড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া[৩৭]

২৩. কসিরউদ্দীন তালুকদার, ডা.

ডা. কসিরউদ্দীন তালুকদার ছিলেন বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার মহিষমুণ্ডা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৭ জুলাই। পিতা মরহুম নকীবউল্লাহ তালুকদার এবং মাতা মরহুমা ফিরমন নেসা। ১৯২৯ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। ১৯৩০ সালে বগুড়া থানা রোডে 'ইউনাইটেড মেডিকেল স্টোর' নামে একটি ডিসপেনসারি খুলে ডাক্তারি জীবন শুরু করেন। ছাত্রজীবনে ১৯২৩ সালে রাজশাহীর এক বনেদি পরিবারের কর্ণধার সৈয়দ মীর মেহের আলীর কন্যা

সৈয়দা জেয়াউন্নাহার খাতুনকে বিয়ে করেন। স্ত্রী সৈয়দা জেয়াউন্নাহার খাতুন ছিলেন ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির মহিলা কমিশনার। ড. কসিরউদ্দীন তালুকদার ও সৈয়দা জেয়াউন্নাহার খাতুনের দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা। তাদের নাম যথাক্রমে– ডা. জিয়া হাসান, আবু হাসান, মাহবুব আরা বেগম, জাহান আরা বিল্লাহ, জেবউননেসা জামান, মনোয়ারা খোন্দকার ও আনজুমান আরা বেগম। তিনি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতেন এবং বগুড়ার মহম্মদ আলীর কাছ থেকে অতি ভালবাসা ও বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে পাওয়া ১৯৩৯ মযেলের 'মরিস' গাড়িটিতে স্টার্ট দিতেন। এরপর গোসল করতে করতে নজরুলের গান– 'বাজলো কিরে ভোরের শানাই' থেকে শুরু করে মেহেদী হাসানের 'হারানো দিনের কথা কথা মনে পড়ে যায়' গাইতেন। ১৯৭০ সালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ১৯৭১ সালে মানুষের তৈরি হানাদার বাহিনীকে প্রতিহত করতে গিয়ে যে মুক্তিযোদ্ধারা আহত হন তাঁদের চিকিৎসার ভার তিনি গ্রহণ করেন। গভীর রাতে তিনি সজাগ থাকতেন যাতে মুক্তিযোদ্ধারা প্রয়োজনের সময় তাঁকে কাছে পায়। ৬ এপ্রিল সপরিবারে বগুড়া থেকে মুরইলে যাওয়ার পথে মানুষের দুঃখ-দুর্শনা দেখে গভীর ক্ষোভের সাথে তিনি বলেন, 'আল্লাহর কাছে হাজার শোকর, আমাকে কোনদিন পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখতে হয়নি।' ক'দিন পরেই তিনি বগুড়া ফিরে যান। ২২ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী বগুড়া শহরে নারকীয় হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড চালায় এবং তাঁর ডিসপেনসারি ধ্বংস করে দেয়। ২৯ মে শনিবার পাকিস্থানি বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায়।

সে দিনের কথা তাঁর স্ত্রী বর্ণনা সন্তানদের কাছে বর্ণনা করেন এভাবে, "তোদের আব্বা সকালবেলায় সবে গোসল সেরেছেন, শরীরটা তাঁর একটু খারাপই ছিল, তবু রোজকার সেই অভ্যাস মতো পরনের লুঙ্গি-গেঞ্জি ধুয়ে মেলে দিলেন। আগের দিন হাত-পায়ের নক কেটে পরিস্কারভাবে গোসল করেছিলেন। সবে নাশতা পর্ব শেষ করেছেন এরি মধ্যে দু'জন যমদূতের মতো সিপাই এসে থানায় ডেকে নিয়ে গেল। বললো, থানা যেতে হবে, একটা এনকোয়ারি আছে এক্ষুনি ফিরে আসবেন।" তাঁর পরবিার ৩১ মে পর্যন্ত পথ চেয়ে বসে থেকেছেন। কিন্তু ডা. সাহেব ফিরে আসেন নি। বগুড়ার দক্ষিণে মাঝিড়াস্থ সেনানিবাসের বধ্যভূমিতে তাঁকেসহ ১১ জনকে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করেছিল।[৩৮]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

গাবতলী উপজেলা

১. শহিদ আব্দুস সাত্তার, পিতা : মৃত মুহাম্মদ মুন্সী, গ্রাম : বটিয়াডাঙ্গা, ইউনিয়ন : দূর্গাহাটা, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া

২. শহিদ ওসমান গনি, পিতা : মৃত দানেশ উদ্দিন, সাং : সালুকগারী, ইউনিয়ন : নেপালতলী, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া

৩. শহিদ মুক্তিযোদ্ধা জাহিদুর রহমান (বাদল), পিতা : মোস্তাফিজার রহমান (দুদু), উনচুরখী, গাবতলী, বগুড়া

৪. শহিদ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান, পিতা : মৃত হাফিজার রহমান, সাং- মড়িয়া, ইউনিয়ন : মহিষাবান, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া

৫. শহিদ মুক্তিযোদ্ধা কাজী আব্দুল মান্নান , পিতা : মৃত কাজী জছিম উদ্দিন, নেপালতলী, গাবতলী, বগুড়া

৬. শহিদ মুক্তিযোদ্ধা মাফুজার রহমান, পিতা : তোসাদ্দেক হোসেন খান, জাইগুলী, গাবতলী, বগুড়া

৭. শহিদ কমর উদ্দিন, পিতা : সরাব আলী, কালাইহাটা, বালিয়াদিঘী, গাবতলী, বগুড়া

৮. শহিদ হাবিলদার কামরুজ্জামান, পিতা : মৃত সরাব আলী, সাং : সোনামুয়া, ইউনিয়ন : বালিয়াদিঘী, গাবতলী, বগুড়া

৯. আহমদ উল্লাহ, গ্রাম : শিমুলটার, ইউনিয়ন : লাংলু দক্ষিণপাড়া, গাবতলী, বগুড়া[৩৯]

আফজাল হোসেন, গ্রাম : শৌলকান্দির, ইউনিয়ন : কাগইল, গাবতলী, বগুড়া[৪০]

১০. মাসুদুল আলম খান (চাঁন্দু), মুক্তিযোদ্ধা

মাসুদুল আলম খান (চাঁন্দু), বগুড়া জেলার ঠনঠনিয়া গ্রামে (ডাকঘর : বগুড়া, উপজেলা : বগুড়া) ১৯৫২ সালের ১৫ জুন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আবদুল খালেক খান। চাঁন্দু আজিজুল হক কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বগুড়া শহর দখল করার জন্য রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এগিয়ে আসে। কিন্তু প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে হানাদার বাহিনী

রংপুরে ফেরত যেতে বাধ্য হয়। অবশেষে ২০-২৫ দিন পর হানাদার বাহিনী বগুড়া শহর দখল করে নেয়। প্রতিরোধ যোদ্ধা মাসুদুল আলম খান চাঁন্দু অন্যান্যদের সাথে ভারতে চলে যান। সেখানে শিলিগুড়ির পানিঘাটা কেন্দ্রে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ৭নং সেক্টরের সেক্টর কামান্ডার কর্নেল কাজী নূরুজ্জামানের অধীনে গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে বিভিন্ন যুদ্ধ সফলভাবে পরিচালনা করেন। বিশেষ করে চিকনি, নিমগাছি, হাতিবান্ধা, বাগবাড়ির যুদ্ধসমূহ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালের ১৪ নভেম্বর গাবতলী উপজেলার দড়িপাড়া গ্রামের তিনি রাজাকারের গুলিতে শাহাদৎবরণ করেন।[৪১]

১১. আবুল হোসেন

আবুল হোসেন বগুড়া জেলার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালের ২৫ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানি হানাদারদের গাবতলী রেলস্টেশন থেকে জয়ভোগা ও বাইগুনী গ্রামের দিকে গুলিবর্ষণ চলতে থাকলে আবুল হোসেনসহ কয়েকজন গ্রামবাসী শহিদ হন।[৪২]

১২. আয়েন উদ্দীন ফকির

আয়েন উদ্দীন ফকিরের জন্ম বগুড়ার গাবতলীর আটবাড়ীয়া গ্রামে, ১৪ ফাল্গুন, ১৩২৫। পিতার নাম ভাদু ফকির; মাতার নাম নেছাতন বেওয়া। তিনি ৩ ভাই, ১ বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। চাককাগইল ও কে কে হাইস্কুলে শিক্ষাগ্রহণ। ১৯৭১ সালে ছিলেন বিবাহিত ও ৪ পুত্র, ৩ কন্যার জনক। বগুড়া পুলিশ লাইনে কনস্টেবল পদে যোগদান; সহকারী দারোগা পদে পদোন্নতি; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সহকারী দারোগা পদে রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানায় কর্মরত; কর্মস্থল থেকে ১৮ নভেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি। ২০ নভেম্বর রাজশাহী পুলিশ লাইনের পাশে বন্দি অবস্থায় হানাদার সেনার গুলিতে শাহাদতবরণ।[৪৩]

১৩. জাহেদুর রহমান (বাদল), মুক্তিযোদ্ধা

জাহেদুর রহমান (বাদল), পিতা : মোস্তাফিজুর রহমান। মাতা : মোছাম্মাৎ গোলেনুর বেগম। গ্রাম : উনচরখি, থানা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া। জাহেদুর রহমান ১৯৬৯ সালে গাবতলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭১ সালে বগুড়া আযিযুল হক সরকারি কজেজে বিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি পিতা-মাতার প্রথশ সন্তান। সুঠাম স্বাস্থ্য ও সুন্দর চেহারা আকর্ষণীয় চেহারার সঙ্গে মাথা ভর্তি মাননসই চুল তার চেহারা আকর্ষণীয় করে রাখত। বন্ধুদের নিয়ে গল্প, হাসি খুশি ও খেলাধুলায় মেতে থাকতে তিনি ভীষণ পছন্দ করতেন। মুক্তিযুদ্ধকালিন সময়েও তার অসংখ্য বন্ধু ও গুণগ্রাহী ছিল। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে বাদল সীমানা অতিক্রম করে ভারতের

মেঘালয় প্রদেশের গোয়ালপাড়া মহকুমার মানকারচরস্থ কাকড়িপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে ১১নং সেক্টর কমান্ডার এর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত রাজিবপুর মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অস্ত্র চালনা এবং গেরিলা যুদ্ধের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি রোস্তম কোম্পানীতে যোগ দেন। ৪ ডিসেম্বর সাঘাটা থানার গোবিন্দী এক সম্মুখ যুদ্ধে তিনি শহিদ হন। মুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন একজন সেকশন কমান্ডার।[৪৪]

১৪. জোনাব আলী আকন্দ, মুক্তিযোদ্ধা

জোনাব আল আকন্দের জন্ম বগুড়ার গাবতলীতে। পিতার নাম দেওয়ান উল্লাহ আকন্দ; মাতার নাম গেন্দ্রি বেওয়া। তিনি ১ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে কনিষ্ঠ। গাবতলী ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ। ১৯৭১ সালে ছিলেন বিবাহিত ও ১ পুত্র, ১ কন্যার জনক। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লালমনিরহাটে কনস্টেবল পদে কর্মরত; কনস্টেবল নং-৬১৩। ১৫ এপ্রিল বগুড়ায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে শাহাদতবরণ; মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।[৪৫]

১৫. মো. জাহিদুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা

মো. জাহিদুর রহমান বগুড়া জেলার উনচুরখী গ্রামে (ডাকঘর ও উপজেলা গাবতলী) ১৯৫৩ সালের ১৫ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোস্তাফিজুর রহমান। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বগুড়া দখল কলে নিলে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন এবং প্রশিক্ষণে জন্য ভারতে চলে যান। সেখানে দার্জিলিং এর মূর্তিমুজিব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি ৬নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার এম. কে. বাশার এর অধীনে গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে বিভিন্ন স্থানে সফলভাবে কৌশলপূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলাধীন পুটিমারির চর নামক স্থানে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সম্মুখযুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জাহিদুর রহমান শহিদ হন।[৪৬]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

কাহালু উপজেলা

১. শহিদ নুরুল আমিন, গ্রাম : খাজলাল, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া
২. শহিদ হেলাল উদ্দিন, গ্রাম : ধানপুজা, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া
৩. শহিদ মাষ্টার আমজাদ হোসেন বি.এ, গ্রাম : ডোমগ্রাম, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া
৪. কালিপদ মজুমদার, গ্রাম : পালপাড়া, কাহালু
৫. ভূপিন্দ্রনাথ মহন্ত, গ্রাম : পালপাড়া, কাহালু
৬. কুড়ানু চন্দ্র, গ্রাম : পালপাড়া, কাহালু
৭. কালা চন্দ্র, গ্রাম : পালপাড়া, কাহালু
৮. অভয় চন্দ্র, গ্রাম : পালপাড়া, কাহালু
৯. রাধান্দ্রনাথ, গ্রাম : পালপাড়া, কাহালু
১০. কৃষ্ণ গোপাল মহন্ত, গ্রাম : পালপাড়া, কাহালু
১১. গৌর গোপাল মহন্ত, গ্রাম : পালপাড়া, কাহালু
১২. শুকরা, গ্রাম : লক্ষীপুর, কাহালু
১৩. ভুলু কসাই, গ্রাম : লক্ষীপুর, কাহালু
১৪. মাহমুদ আলী, গ্রাম : লক্ষীপুর, কাহালু
১৫. আমির আলী (আমু), গ্রাম : লক্ষীপুর, কাহাল[৪৭]
১৬. আমির আলী (আমু), গ্রাম : লক্ষীপুর, কাহালু[৪৮]
১৭. পেমা চন্দ্র, গ্রাম : গিরাইল, কাহালু
১৮. নারায়ন চন্দ্র, গ্রাম : গিরাইল, কাহালু
১৯. ঝটু চন্দ্র, গ্রাম : গিরাইল, কাহালু
২০. রুহিনাথ চন্দ্র, গ্রাম : গিরাইল, কাহালু
২১. চান্দ চন্দ্র, গ্রাম : গিরাইল, কাহালু

২২. রামাকান্ত চন্দ্র, গ্রাম : গিরাইল, কাহালু
২৩. ফতু চন্দ্র, গ্রাম : গিরাইল, কাহালু
২৪. তিলক চাঁন, গ্রাম : গিরাইল, কাহালু
২৫. কর্ণধর, গ্রাম : গিরাইল, কাহালু
২৬. তারাচন্দ্র, গ্রাম : গিরাইল, কাহালু[৪৯]
২৭. অশোক প্রাং, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু [৫০]
২৮. রজিব উদ্দীন সরদার, পিতা : হামিদ সরদার, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু
২৯. নূর উদ্দীন কাজী, পিতা : নবায়ু কাজী, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু
৩০. মিনাকা, পিতা : জসীম উদ্দীন প্রামানিক, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু
৩১. রইচ উদ্দীন কাজী, পিতা : আছিম উদ্দীন কাজী, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু
৩২. আব্দুস সামাদ, পিতা : আব্দুস রমজান প্রামাণিক, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু
৩৩. রমজান আলী প্রামাণিক, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু
৩৪. ছলিম উদ্দীন প্রামাণিক, পিতা : বহরউল্লাহ প্রামাণিক, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু
৩৫. গোলাম উদ্দীন, পিতা : নাবুল্লা শেখ, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু
৩৬. মফিজউদ্দীন কাজী, পিতা : ফাজিল কাজী, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু[৫১]
৩৭. রশিদ আলী, শেখপাড়া, কাহালু
৩৮. খোরশেদ আলী, শেখপাড়া, কাহালু[৫২]
৩৯. খোসা প্রাং, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু
৪০. গোলাম উদ্দিন প্রাং, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু
৪১. ছলিমুদ্দি, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু
৪২. লেবু, গ্রাম : নশিরপাড়া, কাহালু[৫৩]
৪৩. মোহাম্মদ আলী, জয়তুল গ্রাম, কাহালু
৪৪. আকবর আলী, জয়তুল গ্রাম, কাহালু
৪৫. আব্দুল খালেক, জয়তুল গ্রাম, কাহালু
৪৬. লছির প্রাং, জয়তুল গ্রাম, কাহালুৎ
৪৭. আব্দুস সামাদ প্রাং, জয়তুল গ্রাম, কাহালু
৪৮. আব্দুল জোব্বার প্রাং, জয়তুল গ্রাম, কাহালু
৪৯. আব্দুল মালেক প্রাং, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৫০. আফসার আলী প্রাং, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৫১. সেদু শাহ্, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৫২. দছির শাহ্, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৫৩. ধলু প্রাং, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৫৪. রমজান আলী প্রাং, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৫৫. লবিস শাহ্, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৫৬. ছহির উদ্দিন, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৫৭. মহির উদ্দিন, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৫৮. হেতা প্রাং, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৫৯. হাতিম প্রাং, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৬০. হযরত শেখ, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৬১. বছির উদ্দিন শেখ, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৬২. মকবুল শেখ, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৬৩. আব্দুল মালেক শেখ, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৬৪. লিতো, জয়তুল গ্রাম, কাহালু

৬৫. দছিমউদ্দিন শাহা জয়তুল গ্রাম, কাহালু[৫৪]

৬৬. মুকুল বহার, মুরইল ইসলামিয়া মাদ্রাসা, কাহালু[৫৫]

[*শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা*]

নন্দীগ্রাম উপজেলা

১. শহিদ আকরাম হোসেন, পিতা : মৃত করমুতুল্ল্যাহ সরকার, গ্রাম : চাকলমা, ইউনিয়ন : ভাটগ্রাম, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

২. শহিদ আব্দুল ওহেদ, পিতা : মৃত বাসতুল্ল্যা, গ্রাম : বাদলাশনা, ইউনিয়ন : ভাটগ্রাম, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

৩. শহিদ মরু মন্ডল (মহিউদ্দিন), পিতা : মৃত কানু মন্ডল, গ্রাম : রুস্তমপুর, ইউনিয়ন : ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

৪. শহিদ জসিমুদ্দিন আহম্মেদ, পিতা : মৃত লতিবুল্ল্যা, গ্রাম : হাটকড়ই, ইউনিয়ন : ভাটগ্রাম, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

৫. শহিদ আব্দুর রশিদ, পিতা : মৃত লতিবুল্ল্যা, গ্রাম : হাটকড়ই, ইউনিয়ন : ভাটগ্রাম, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

৬. শহিদ আব্দুর রাজ্জাক, পিতা : শহিদ জসিমুদ্দিন আহম্মেদ, গ্রাম : হাটকড়ই, ইউনিয়ন : ভাটগ্রাম, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

৭. শহিদ মোফাজ্জল হোসেন, পিতা : আব্দুল গফুর, নন্দীগ্রাম, বগুড়া

৮. আব্দুর সোবাহান, গ্রাম : ভাটরা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া [৫৬]

৯. শহিদ আব্দুল মজিদ, পিতা : মৃত আব্দুস সোবাহান, গ্রাম : ভাটরা, ইউনিয়ন : ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

১০. শহিদ মফিজ উদ্দিন, পিতা : মৃত তালেব আলী, গ্রাম : মুরাদপুর, ইউনিয়ন : বুড়ইল, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

১১. সুরেশ চন্দ্র, হাটকড়ই, নন্দীগ্রাম, বগুড়া

১২. বুজেশ্বর চন্দ্র, হাটকড়ই, নন্দীগ্রাম, বগুড়া

১৩. সুরেস চন্দ্র প্রামানিক, হাটকড়ই, নন্দীগ্রাম, বগুড়া

১৪. অধির চন্দ্র, হাটকড়ই, নন্দীগ্রাম, বগুড়া[৫৭]

১৫. প্রানবন্ধু চন্দ্র কবিরাজ, পিতা : হর চন্দ্র কবিরাজ, গ্রাম : বামন, ইউনিয়ন : ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

১৬. মনিন্দ্র চন্দ্র সাহা, পিতা : পূর্ণ চন্দ্র সাহা, গ্রাম : বামন, ইউনিয়ন : ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

১৭. প্রানকান্ত চন্দ্র প্রামানিক, পিতা : নীল কান্ত চন্দ্র প্রামানিক, গ্রাম : বামন, ইউনিয়ন : ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

১৮. পূর্ণ চন্দ্র সাহা, পিতা : বনমালী চন্দ্র সাহা, গ্রাম : বামন, ইউনিয়ন : ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

১৯. সুখি রবিদাস, পিতা : ভরত রবিদাস, গ্রাম : ভাগবজর, ইউনিয়ন : ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

২০. রামদেব রবিদাস, পিতা : রিক্ষয় রবিদাস, গ্রাম : ভাগবজর, ইউনিয়ন : ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

২১. বলরাম চন্দ্র প্রামানিক, পিতা : প্রহল্লাথ প্রামানিক, গ্রাম : ওলান, ইউনিয়ন : ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

২২. রমানাথ সরকার, পিতা : শ্যামনাথ সরকার, গ্রাম : ওলান, ইউনিয়ন : ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া

২৩. রবি চন্দ্র প্রামানিক, পিতা : রঘুনাথ প্রামানিক, গ্রাম : নাগরকান্দি, ইউনিয়ন : ভাটরা, উপজেলা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া[৫৮]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

শাজাহানপুর উপজেলা

১. গঞ্জেস চন্দ্র চৌধুরী, পিতা : গোপাল চন্দ্র চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

২. গিরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, পিতা : হরে কৃষ্ণ চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৩. শচীন চন্দ্র চৌধুরী, পিতা : হরে কৃষ্ণ চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৪. ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পিতা : গিরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৫. প্রদীপ কুমার, পিতা : ক্ষিতিশ চন্দ্র চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৬. মহাবীর চন্দ্র সাহা, পিতা : জগৎ চন্দ্র সাহা, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৭. নারায়ণ চন্দ্র মোহন্ত, পিতা : রামেশ্বর মোহন্ত, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৮. আনন্দ অধিকারী (সুটকু), পিতা : গৌর গোপাল অধিকারী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৯. রুক্কিনী কর্মকার, পিতা : হরি কর্মকার, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

১০. গুপি কান্ত সাহা, পিতা : লক্ষী কান্ত সাহা, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

১১. নিতু দত্ত, পিতা : বেণী দত্ত, গ্রাম ও ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

১২. রঘু মোহন্ত, পিতা : বিপীন মোহন্ত, গ্রাম ও ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

১৩. সমর চৌধুরী, পিতা : যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, গ্রাম ও ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

১৪. হরিপদ অধিকারী, পিতা : বেণী মাধব অধিকারী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

১৫. দুরাল চন্দ্র সাহা, পিতা : দিনেশ চন্দ্র সাহা, জলেশ্বরীতলা, উপজেলা : বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া

১৬. স্বপন চন্দ্র সাহা, পিতা : হরি লাল সাহা, জলেশ্বরীতলা, উপজেলা : বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া

১৭. রবীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, পিতা : তারা নাথ বিশ্বাস, জলেশ্বরীতলা, উপজেলা : বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া

১৮. মিহির কুমার সাহা, (বাস : বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া), ঝিকিরা, উল্লপাড়া, সিরাজগঞ্জ

১৯. দীজেন্দ্র চন্দ্র সাহা, (বাস : বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া), পিতা : যদু নাথ চন্দ্র সাহা, ঝিকিরা, উল্লপাড়া, সিরাজগঞ্জ

২০. পরেশ চন্দ্র শীল, (বাস : বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া), পিতা : প্রকন্ন চন্দ্র সাহা, সেতাবগঞ্জ সুগার মিল, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর[৫৯]

২১. ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

২২. ডা ঃ শচিন্দ্র নাথ চৌধুরী, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া[৬০]

২৩. ফনিন্দ্রনাথ দেব, গ্রাম : পালপাড়া, ইউনিয়ন : আড়িয়া, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

২৪. তপন পাল, গ্রাম : পালপাড়া, ইউনিয়ন : আড়িয়া, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

২৫. সুরেশ পাল, গ্রাম : পালপাড়া, ইউনিয়ন : আড়িয়া, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

২৬. খোকা বৈরাগী, গ্রাম : পালপাড়া, ইউনিয়ন : আড়িয়া, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

২৭. মুনির, ইউনিয়ন : আড়িয়া, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া[৬১]

২৮. মছিরউদ্দিন, গ্রাম : ডেমাজানি, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

২৯. মোখলেছুর রহমান, গ্রাম : মাঝিপাড়া, ইউনিয়ন : আমরুল, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৩০. দীনেন্দ্রনাথ সাহা, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৩১. ফুলেল চন্দ্র সাহা, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৩২. স্বপন চন্দ্রসাহা, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৩৩. মজিবর রহমান, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৩৪. ধনু মিয়া, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৩৫. আব্দুল লতিফ মন্ডল, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৩৬. শহিদ বাচ্চু মিয়া, গ্রাম : চাঁচাইতারা, ইউনিয়ন : মাদলা, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৩৭. শহিদ আফসার সরদার, লিচুতলা, বগুড়া শহরতলী, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৩৮. শহিদ জাহাঙ্গীর সরদার, পিতা : শহিদ আফসার সরদার, লিচুতলা, বগুড়া শহরতলী, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া

৩৯. মো. মাসুদ আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা

মো. মাসুদ আহমেদ একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি শাজাহানপুরের আড়িয়া বাজারের রেইড নামক এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। তার পিতার নাম ডাক্তার টি আহমেদ। বগুড়া জেলার গোহাইল রোড়, সুত্রাপুরে তাঁর বাড়ি। তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। বগুড়া শহরের মিশন হাসপাতালের পূর্ব পার্শ্বে তার সমাধিস্থল।[৬২]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

সারিয়াকান্দি উপজেলা

১. শহিদ আব্দুল মান্নান, পিতা : মৃত ময়েন উদ্দিন, গ্রাম : বাঘবেড়, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

২. শহিদ মমতাজুর রহমান মুন্টু, পিতা : মৃত তৈয়ব আলী প্রাং, গ্রাম : শালুখা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

৩. শহিদ সিরাজুল ইসলাম, পিতা : মৃত সৈয়ব আলী, গ্রাম : নিউসোনাতলা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

৪. শহিদ মোজাফ্ফ রহমান, পিতা : মৃত মজিবর রহমান, গ্রাম : কাটাখালী, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

৫. শহিদ মাহমুদুল আলম খান, পিতা : মৃত আব্দুস ছালেক, গ্রাম : রৌহদহ, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

৬. শহিদ মমতাজুর রহমান, পিতা : মৃত আমীর উদ্দিন, গ্রাম : বালুয়ারতাইড়, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

৭. শহিদ আব্দুল হামিদ, পিতা : মৃত জরিতুল্যাহ প্রাং, গ্রাম : উল্যাডাঙ্গা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

৮. শহিদ তবিবর রহমান, পিতা : মৃত আব্দুল মালেক, গ্রাম : তালতলা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

৯. শহিদ রফিকুল ইসলাম, পিতা : মৃত নওশেদ আলী, গ্রাম : বোহাইল, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

১০. শহিদ আব্দুল ওয়াজেদ হোসেন, পিতা : মৃত জছিম উদ্দিন, গ্রাম : খোর্দ্দবলাইল, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

১১. শহিদ তবিবর রহমান, পিতা : মৃত ইলিক মাহমুদ, গ্রাম : খোর্দ্দবলাইল, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

১২. আব্দুল জলিল, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

১৩. মমতাজ উদ্দিন, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

১৪. মোজাম্মেল হক, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া [৬৩]

১৫. শহিদ সোহরাব হোসেন, পিতা : মৃত আব্দুস ছাত্তার, গ্রাম : দিঘলকান্দি, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

১৫. শহিদ এ,কে,এম আবু তৈয়ব, পিতা : মৃত এনায়েতুল্যা, গ্রাম : শাকদহ, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

১৬. শহিদ নজির হোসেন, পিতা : মৃত নবি আকন্দ, গ্রাম : পাকুরিয়া, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

১৭. শহিদ আব্দুল জলিল, পিতা : মৃত নঈম উদ্দিন মন্ডল, গ্রাম : চরপাড়া, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

১৮. শহিদ মোস্তাফিজার রহমান, পিতা : মৃত বরকত উল্যাহ, গ্রাম : গণকপাড়া, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া

১৯. আক্কাছ আলী

আক্কাছ আলীর জন্ম বগুড়ার সারিয়াকান্দির নিজবলাইল গ্রামে, ১৯৫১ সালে। পিতার নাম : আবুল কাশেম আকন্দ; মাতার নাম : মোছা. পঞ্চ বেওয়া। তিনি ১ ভাই, ১ বোনের মধ্যে প্রথম। নিজবলাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সুখানপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ। ১৯৬৯ সালে কনস্টেবল পদে রাজশাহী জেলা পুলিশ লাইনে যোগদান; প্রশিক্ষণ শেষে রাজশাহী জেলায় নিযুক্তি; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহী পুলিশ লাইনে কর্মরত; কনস্টেবল নং-১২৪২। প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ; ২৮ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর রাজশাহী পুলিশ লাইন আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শাহাদতবরণ; প্রত্যক্ষদর্শী কনস্টেবল দেলোয়ার হোসেন এর দেওয়া তথ্য মতে মৃতদেহ রাজশাহী পুলিশ লাইনের কবরস্থানে সমাহিত।[৬৪]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

শেরপুর উপজেলা

১. আজহার আলী ফকির, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
২. ওসমান গনি ফকির, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৩. আজিজুর রহমান ফকির, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৪. একরামুল হক ফকির, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৫. সুজির উদ্দিন, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৬. সেকেন্দার আলী, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৭. বুলমাজন আলী, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৮. রমজান আলী, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৯. মোখলেছার রহমান, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
১০. ইছাহাক আলী, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
১১. আবেদ আলী, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
১২. আলিম উদ্দিন, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
১৩. ছোবাহান আলী, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
১৪. গুইয়া প্রামাণিক, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
১৫. দলিল উদ্দীন, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
১৬. হাছেন আলী, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
১৭. উজির উদ্দীন, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
১৮. আয়েন উদ্দীন, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
১৯. আফজাল হোসেন, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
২০. মোহাম্মদ আলী, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
২১. আজিম উদ্দীন, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
২২. নেওয়াজ উদ্দীন, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া

২৩. হায়দার আলী, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
২৪. জপি প্রামাণিক, দড়িমুকুন্দ, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া [৬৫]
২৫. আফজাল হোসেন, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
২৬. গণি, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
২৭. মোনসের আলী, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
২৮. দুলু মণ্ডল, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
২৯. জহির উদ্দিন মণ্ডল, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৩০. মোফাজ্জল ফকির, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৩১. নবা ফকির, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৩২. সূরুজ আলী, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৩৩. হয়রত, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৩৪. আফসার মণ্ডল, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৩৫. সেফাত মণ্ডল, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৩৬. ইদ্রিস, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া [৬৬]
৩৭. সাত্তার মণ্ডল, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৩৮. আজিজার মণ্ডল, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৩৯. আয়েজ মণ্ডল, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৪০. আকবর আলী, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া [৬৭]
৪১. শরকত মন্ডল, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৪২. আলতাফ সেখ, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৪৩. কুদ্দুস, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৪৪. হোসেন, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৪৫. খোকা, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৪৬. ঈমান, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৪৭. রিয়াজ উদ্দিন, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৪৮. যদিমুদ্দিন, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৪৯. সদর আলী সরকার, বাগড়া কলোনী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া [৬৮]
৫০. বীরেন্দ্রনাথ পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া

৫১. জোগেস্বর পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৫২. ধলু/ঢলু পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৫৩. মতিলাল পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৫৪. হারান পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৫৫. সুদেব পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৫৬. রাজেন পালন, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৫৭. লাল বিহারী পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৫৮. চিত্ত পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৫৯. কৃষ্ণ পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৬০. ক্ষুদিরাম পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৬১. রাধিকা পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৬২. নরেন্দ্র মহন্ত, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৬৩. বাদল পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৬৪. মনিন্দ্র নাথ পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৬৫. নারায়ন পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৬৬. মনিন্দ্রনাথ প্রকৌশলী, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৬৭. পুষ্প পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৬৮. নেংড়া পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৬৯. শ্রীবাস শীল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া[৬৯]
৭০. ফুরিয়া পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৭১. শ্রীদীপ পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৭২. ন্যাড়া পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
৭৩. বিহারী পাল, গ্রাম : কল্যাণী, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া[৭০]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

শিবগঞ্জ উপজেলা

১. শহিদ মুক্তিযোদ্ধা হাফিজার রহমান শেখ, পিতা : মৃত মো. খেজমতুলাহ শেখ, গ্রাম : সাদুলাপুর, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া
২. আব্দুস ছাত্তার (কমান্ডার), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া
৩. তুষার কান্তি মজুমদার (২৪), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া
৪. অরুনকান্তি (২২), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া
৫. পাঁচকড়ি (২২), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া
৬. সুরেশা (৫০), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া
৭. দিপুঘোষ (২০), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া
৮. চেরু ঘোষ (২৮), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া
৯. রমেনা (৪৫), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া
১০. করুনকান্তি (২৭), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া
১১. বনবাহাদুর (২৮), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া
১২. কালিপদ (৪০), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

১৩. ললিত সোনার (৩০), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

১৪. নরেশ (৩৫), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

১৫. কফিল (১৮), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

১৬. মোস্তফা (২৮), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

১৭. আঃ জোব্বার (৩০), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

১৮. আঃ বারী (২০), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

১৯. পরেশ (৩০), গ্রাম : মজুমদারপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া [৭১]

২০. আবুল হোসেন, শিবগঞ্জ পৌর এলাকা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

২১. আফজাল হোসেন, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

২২. হরগবিন্দ, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

২৩. তারাজুল ইসলাম, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

২৪. ডা. মো. তালেব, গ্রাম : পারআকলাই, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া [৭২]

২৫. বানাইল গ্রামের রবীন্দ্রনাথ মোহন্ত বাদলের বৃদ্ধা মা, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও ছোট ৪ ছেলেমেয়ে

২৬. এম. এ. হাফিজ

চিকিৎসক এম. এ. হাফিজ ছিলেন বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার গ্রামের বাসিন্দা। সময়ের সাহসী সন্তান এম. এ. হাফিজ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শহিদ হন। [৭৩]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

সোনাতলা উপজেলা

১. শহিদ সাবু (মুক্তিযোদ্ধা), উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া

২. শহিদ কালু (মুক্তিযোদ্ধা), উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া

৩. শহিদ শুকরো, পিতা : আব্দুল জলিল, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া

৪. মো. সাত্তার ফিল্লম্যান, রাণীরহাট, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া [৭৪]

৫. আবু মো. সাইদুজ্জামান

আবু মো. সাইদুজ্জামানের জন্ম বগুড়ার সোনাতলার হলিদাবাগ গ্রামে, ১০ জুলাই ১৯২২। পিতার নাম আছালত জামান; মাতার নাম ছালমা বেগম। তিনি ১ ভাই, ২ বোনের মধ্যে প্রথম। হুয়াকুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সোনাতলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ। ১৯৭১ সালে ছিলেন বিবাহিত ও ৩ পুত্র, ৩ কন্যার জনক। ১৯৪৯ সালে সৈয়দপুরে কনস্টেবল পদে যোগদান; সহকারী সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে পদোন্নতি; ৮ বছর পর সাব ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি লাভ; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বৃহত্তর রংপুর জেলার (বর্তমানে গাইবন্ধা) সাদুল্লাপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত। মুক্তিযুদ্ধের সময় কর্মরত থাকাকালীন পাকিস্তানি সেনাদের বিভিন্ন কথা মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট প্রদান ও বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার কারণে ৮ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক অপহৃত; প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, ১০ ডিসেম্বর সাদুল্লাপুর চত্বরে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক শাহাদতবরণ এবং মৃতদেহ ২ সহযোগিসহ একই গর্তে সমাহিত। [৭৫]

৬. আব্দুল করিম বেপারী

আব্দুল করিম বেপারী জন্ম বগুড়ার সোনাতলার সুজায়েতপুর গ্রামে। পিতার নাম পরশ উল্লা বেপারী; মাতার নাম মিসিরন বেওয়া। তিনি ৪ ভাই, ১ বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। সুজায়েতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সোনাতলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ; ১৯৭১ সালে ছিলেন বিবাহিত ও ২ কন্যার জনক। ১৯৬২ সালে সারদা পুলিশ একাডেমীতে কনস্টেবল পদে যোগদান; প্রশিক্ষণ শেষে রংপুর জেলার নীলফামারী থানায় যোগদান; কর্মক্ষেত্রে বগুড়ায় নিযুক্তি; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বগুড়া পুলিশ লাইনে কর্মরত; কনস্টেবল নং- ২১১। প্রতিরোধ যুদ্ধে

যোগদান। ২৯ মার্চ ১৯৭১ বগুড়া সুবিল মহিলা কলেজের সামনে সংঘতি যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে শাহাদতবরণ; ৩০ মার্চ বগুড়া নামাজগড় গোরস্থানে তার লাশ সমাহিত।[৭৬]

৭. রমজান আলী প্রামাণিক, মুক্তিযোদ্ধা

রমজান আলী প্রামাণিকের জন্ম বগুড়ার সোনাতলার শিহীপুর (পশ্চিম পাড়া) গ্রামে, ১৯৪৪ সালে। পিতার নাম আলীম উদ্দিন প্রামাণিক; মাতার নাম রজিমা। তিনি ৫ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে প্রথম। জাহানারা পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সুখান পুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণ। ১৯৭১ সালে ছিলেন বিবাহিত ও ১ কন্যার জনক। ১১ জুলাই ১৯৬৬ সারে কনস্টেবল-৮৫৫ পদে পাবনা জেলায় পুলিশে যোগদান; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে কর্মরত। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় নওয়াদা বগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিম প্রাঙ্গণে পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদৎবরণ, মৃতদেহ নিজ বাড়িতে সমাহিত।[৭৭]

[*শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা*]

পরিশিষ্ট ২
বগুড়া জেলার বাসিন্দা যারা অন্য জেলায় শহিদ হয়েছেন–

১. হাতিম আলী

হাতিম আলী ছিলেন বগুড়ার অধিবাসী। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে ফায়ারম্যা/ডিএমই/পাকশী পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল শহিদ হন।[৭৮]

২. জি আর খান

জি আর খান ছিলেন বগুড়ার বাসিন্দ। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে গার্ড/ডিসিও/পাকশী পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর শহিদ হন।[৭৯]

৩. আনন্দ

আনন্দ ছিলেন বগুড়ার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে ওয়েম্যান/ডিই এন পদে লালমণিরহাটে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১০ সেপ্টেম্ব শহিদ হন।[৮০]

৪. আব্দুল নূর

আব্দুল নূর ছিলেন বগুড়ার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে টুনা কিপার/ডিএমই/পাকশী পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালে ১৬ জুন শহিদ হন।[৮১]

৫. আহমদ আলী প্রামাণিক

আহমদ আলী প্রামাণিক ছিলেন বগুড়া জেলার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে সান্টার/ডিএমই/পাকশী পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর শহিদ হন।[৮২]

৬. ইব্রাহিম মণ্ডল

ইব্রাহিম মণ্ডল ছিলেন বগুড়া জেলার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে পিয়ন/ডিটিও পদে পাকশীতে কর্মরত ছিলেন। তিনি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর শহিদ হন।[৮৩]

৭. ইয়াসিন আলী মণ্ডল

ইয়াসিন আলী ছিলেন বগুড়া জেলার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে টি/স্মীথ পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল শহিদ হন।[৮৪]

৮. এ. কে. এম. শামসুদ্দিন

১৯২৯ সালের ১৪ অক্টোবর বগুড়ার গোকুল গ্রামে শহিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিনের জন্ম। পিতা আবুল খায়ের মোহাম্মদ সুলায়ামান। শহিদ শামসুদ্দিন ১৯৫১ সালে বি.এস.সি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। পরে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯৫২ স্রণ তিনি কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পে যোগদান করেন। যোগদান থেকে শহিদ হবার আগে পর্যন্ত তিনি অন্য কোথাও চাকুরি করেন নি বা বদলী হননি। বালা যায় কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। কাপ্তাইয়ের তিনটি বিদ্যুৎ ইউনিট তাঁর হাতেই স্থাপনা।[৮৫]

৯. এম. এ জলিল

এম. এ জলিল ছিলেন বগুড়া জেলার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে এস এস/ডিসিও পদে পাকশীতে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল শহিদ হন।[৮৬]

১০. কাউসুর আলী

কাউসুর আলী ছিলেন বগুড়া জেলার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিসি আইসি/আর এমডিএ/ পাকশী পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তান হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১২ জুলাই শহিদ হন।[৮৭]

১১. কে. এম নজরুল ইসলাম

কে. এম নজরুল ইসলাম ছিলেন বগুড়া জেলার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে এফ আই এসি/এসটি ওয়াই পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারী শহিদ হন।[৮৮]

১২. গোলাম মোহাম্মদ পাইকার

বগুড়ার জলেশ্বরীতলার আলহাজ্ব এস. এম. পাইকারের পুত্র গোলাম মোহাম্মদ পাইকার জয়পুরহাটের যুদ্ধে শহিদ হন। তাঁকে জয়পুরহাটে সমাহিত করা হয়।[৮৯]

১৩. ছালিম

ছালিম ছিলেন বগুড়ার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে ওয়েম্যান/ডিইএন পদে লালমণিরহাটে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তান হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর শহিদ হন।[৯০]

১৪. জসিম উদ্দিন আহাং

জসিম উদ্দিন আহাং ছিলেন বগুড়া জেলার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে আর এস এম/ডিটিএস/লালমণিরহাট পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২১ মে শহিদ হন।[৯১]

১৫. জালাল উদ্দিন আকন্দ

জালাল উদ্দিন আকন্দ ছিলেন বগুড়ার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে সেডডি/ম্যান পদে লালমণিরহাটে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক ৫ এপ্রিল শহিদ হন।[৯২]

১৬. মমতাজুর রহমান

মমতাজুর রহমান ছিলেন বগুড়া জেলার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে করণিক/ডিটিএস/লালমণিরহাট পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল শহিদ হন।[৯৩]

১৭. লুৎফর রহমান

লুৎফর রহমান ছিলেন বগুড়ার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে ওয়েম্রান/ডি ই এন/ লালমণিরহাট পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর শহিদ হন।[৯৪]

১৮. শুকুর

শুকুর ছিলেন বগুড়া জেলার বাসিন্দা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে ফিটার/ডিএমই/পাকশী পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল শহিদ হন।[৯৫]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

পরিশিষ্ট ৩

অন্য জেলার বাসিন্দা যাঁরা বগুড়ায় শহিদ হয়েছেন–

১. আব্দুল কাদের

আব্দুল কাদেরর জন্ম সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের মালতীভাঙ্গ গ্রামে। পিতার নাম রফি প্রামাণিক; মাতার নাম ফজিলাতুন্নেছা। তিনি ১ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে প্রথম। দৌলতপুর হাই স্কুল ও সিরাজগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে শিক্ষাগ্রহণ। ১৯৭১ সালে ছিলেন বিবাহিত ও ২ পুত্র ও ১ কন্যার জনক। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ওএসআই পদে বগুড়া জেলায় দায়িত্ব পালন; ওএসআই নং-১২৩। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১২ ডিসেম্বর সকাল ৭টার সময় বগুড়া জেলায় কর্মরত অবস্থায় পাকিস্তানিসেনার গুলিতে শাহাদতবরণ; মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।[৯৬]

২. ইউনুস আহম্মদ খান

ইউনুস আহম্মদ খান জন্ম নড়াইলের মির্জাপুর গ্রামে। পিতার নাম নূর মহম্মদ খান, মাতার নাম আমবিয়া খাতুন। তিনি ২ ভাই, ২ বোনের মধ্যে প্রথম। মির্জাপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিংগা শোলপুরে কে.জি এইচ.ই স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ। ১৯৭১ সারে ছিলেন বিবাহিত ও ১ পুত্র, ২ কন্যার জনক। ১৯৪৬ সালে নদীয়া জেলার গোয়ারী কৃষ্ণনগরে পুলিশে যোগদান; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কনস্টেবল পদে বগুড়া জেলার শেরপুর থানায় কর্মরত; কনস্টেবল নং-৫৩৮। ২১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বগুড়া জেলায় কর্মরত অবস্থায় শাহাদৎবরণ এবং সেখানেই সমাহিত।[৯৭]

৩. গোলজার হোসেন খান

গোলজার হোসেন খানের জন্ম টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরের অর্জুনা গ্রামে। পিতার নাম বজলুর রহমান, মাতার নাম মোছা. আফছন বেওয়া। তিনি ৫ ভাইয়ের

মধ্যে প্রথম। অর্জুনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হেমনগর শশীমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ। ১৯৭১ সালে ছিলেন বিবাহিত ও ২ পুত্র, ৪ কন্যার জনক। ১৯৫২ সালে বগুড়া পুলিশ লাইনে কনস্টেবল পদে যোগদান; ১৯৬৭ সালে দিনাজপুর, ১৯৬৯ সালে বগুড়ায় হেড কনস্টেবল হিসাবে নিযুক্তি; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বগুড়া জেলা পুলিশ লাইনে কর্মরত; হেড কনস্টেবল নং-১১৭। ২৩ মে বগুড়া পুলিশ লাইনে পাকিস্তানি সেনার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদতবরণ; মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।[৯৮]

৪. নগেন্দ্রনাথ নন্দী

নগেন্দ্রনাথ নন্দী ১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রাজাকার আল-বদরদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। তিনি ১৯০১ সালের ২২ অক্টোবর বৃহত্তর বগুড়া জেলার (বর্তমান জয়পুরহাট) ক্ষেতলাল থানাধীন পৌলুঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় দূর্গানাথ নন্দী ছিলেন তাঁর পিতা। নগেন্দ্রনাথের চার ভাই ও এক বোন। তিনি ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। বড় ভাই সতীশ চন্দ্র নন্দী তৎকালীন জেলা জজের একজন জুরি। পরবর্তীকালে তিনি ক্ষেতলালা থানাধীন আলমপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। একটানা প্রায় বিশ বৎসর তিনি এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। মেজ ভাই যতীশ চন্দ্র নন্দী এই এলাকার ফতেসিং নাহার নামক একজন জমিদারের নায়েব ছিলেন এবং সেজ ভাই যোগেন্দ্রনাথ নন্দী ছিলেন একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। অ্যাডভোকেট নগেন্দ্রনাথ নন্দী ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২৬ সালে বি.এল ডিগ্রী লাভ করেন। একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে তিনি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯২৭ সালের ২৩ জুন বগুড়া জেলা অ্যাডভোকেটস বারের সদস্য তালিকাভুক্ত হন এবং নিয়মিতভাবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বগুড়া শহরের টিনপট্টি বেলতলার নিজস্ব বাসভবনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সৎ নিষ্ঠাবান ও শঅন্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। আইনের প্রতি ছিলেন তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং আইন পেশায় খ্যাতিও অর্জন করেন। রাজনীতির সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে না পড়লেও একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে মাতৃভূমির প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় মমত্ববোধ। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫২

সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে তাঁর দৃঢ় সমর্থণ ছিল। লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী বাঙালির মতো তাঁর বিবেকেও নাড়া দিতো। তাই শোষণমুক্ত স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হয়ে বাঁচার স্বপ্ন ছিল তাঁর হৃদয়ে সদা-জাগ্রত। তিনি ভালোবেসেছেন এ দেশকে, ভালবেসেছেন এ দেশের মাটি ও মানুষকে। এ দেশের মাটি ও মানুষ তাঁকে মায়ার বাঁধনে ধরে রেখেছিল সারা জীবন। তাইতো তিনি '৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও এ জন্মভূমি ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হন নি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৪ এপ্রিল তিনি তাঁর পরিবারসহ বগুড়া জেলার কাহালু থানাধীন লক্ষ্মীপুর গ্রামে কালীবাবু নামক এক মক্কেলের বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৬ এপ্রিল দুপুর দেড়টা/দু'টার সময় রাজাকার আলবদরের ২০/২৫ জন সদস্য অতর্কিত সে বাড়িতে হামলা চালায় এবং সর্বস্ব লুট করে। তারা অ্যাডভোকেট নন্দী ও তাঁর ছোট ছেলেসহ কালীবাবুকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় এবং হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। ইতিহাসের কুখ্যাত ঘাতক নরপশুরা তাঁদেরকে কাহালু বাজার থেকে কিছুদূরে নিয়ে গেয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। বর্তমানে তাঁর দুই ছেলে, স্ত্রী-পুত্রসহ বগুড়া শহরের টিনপট্টি পৈত্রিক বাসভবনে বহু কষ্টে জীবন যাপন করছেন।[৯৯]

৫. হেমরঞ্জন চাকমা

হেমরঞ্জন চাকমা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল (ইপিআর) বগুড়ায় কর্মরত ছিলেন। তিনি চাকমা বগুড়া সেক্টরে নিখোঁজ হন। তার লাশও পাওয়া যায়নি।[১০০]

৬. অ্যামি মারমা

অ্যামি মারমা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল (ইপিআর) বগুড়ায় কর্মরত ছিলেন। তিনিও বগুড়া সেক্টরে যুদ্ধে শহিদ হন।[১০১]

৭. শহিদ সুজিত

১৪ ডিসেম্বরে ময়মনসিংহের ছেলে সুজিত বর্মণ বগুড়ায় শহিদ হন । তিনি সান্তাহারের বীরমুক্তিযোদ্ধা এলকে আবুলের গ্রুপে যুদ্ধরত ছিলেন । শ্যামলা বর্ণের ছিপছিপে সুজিতের মুখমন্ডল ছিল গোলাকার ও স্বাস্থ্য ছিল ক্ষীণ।

১৯৭১ সালে তিনি বি,এস,সি ক্লাশে পড়তেন। ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা রোড রেল ক্রসিংয়ে শহিদ সুজিত রেললাইনের ওপর একই সাথে ৮টি এন্ট্রি ট্যাঙ্ক মাইন পুঁতে রাখে। তিনি ট্রেন আসার এবং একই সাথে সাথে ব্লাস্ট করার প্রতীক্ষায় থাকেন। কিন্তু সংযোগ প্রদানে ভুল থাকার কারণে কিংবা তারে কোনো লিকেজ থাকার কারণে অথবা অন্য কোনো ত্রুটির জন্য ট্রেন আসার আগেই মাইনগুলোর বিস্ফোরণ ঘটে এবং সে মাইন বিস্ফোরণের আঘাতে সুজিত ঘটনাস্থলে শহিদ হন।[১০২]

[শহিদের অসম্পূর্ণ তালিকা]

পরিশিষ্টের তথ্যসূত্র

১. সাক্ষাৎকারঃ গাজীউল হক, 'সশস্ত্র প্রতিরোধ বগুড়া', *যুদ্ধদলিল*, তারিখ : ২১ আগস্ট ১৯৮৩

২. সাক্ষাৎকারঃ গাজীউল হক, 'সশস্ত্র প্রতিরোধ বগুড়া', *যুদ্ধদলিল*, তারিখ : ২১ আগস্ট ১৯৮৩

৩. গোকুল রামশহরের পীরবাড়ি গণহত্যার শিকার শহিদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ থেকে সংগৃহিত

৪. 'স্মৃতিস্তম্ভে '৭১' বগুড়া পুলিশ লাইন থেকে সংগৃহিত

৫. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৩

৬. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

৭. সংগ্রহ : আহম্মেদ শরীফ, স্মৃতিস্তম্ভ, আজিজুল হক কলেজ (পুরাতন শাখা), ফুলবাড়ি, বগুড়া

৮. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৮ ডিসেম্বর, ২০১৬

৯. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আলহাজ্ব মোঃ তোজাম্মেল হোসেন, বগুড়া শহর আওয়ামী লীগের ২০ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন সভাপতি, বয়স-প্রায় ৭৫ সাক্ষাৎকারের স্থান : নিজ বাসভবন, বগুড়া, ২৮ এপ্রিল ২০১৪

১০. http://sadar.bogra.gov.bd

১১ . http://ajkerpatrika.com/sarabangla/2015/12/07/61823

১২. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ২৯৭

১৩. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ২৭৭

১৪. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ২৯৫

১৫. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ২৩৫

১৬. http://www.sadar.bogra.gov.bd/site/page/ae79

১৭. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ২৪৩

১৮. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ৩৩৪

১৯. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ৩৮৯

২০. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ৪০৪

২১. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮

২২. সুদিন ব্রিজ বধ্যভূমিতে শহিদের স্মৃতি স্তম্ভ থেকে সংগৃহিত

২৩. সাক্ষাৎকার : হাজী মো: মোজাম্মেল হক (৬৭), অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : পূর্ব ডালম্বা, ইউনিয়ন : নশরতপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

২৪. সাক্ষাৎকার : মো. আবু তাহের (৬৬), অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী ও মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : ধনতলা, ইউনিয়ন : নশরতপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

২৫. সাক্ষাৎকার : আব্দুল হামিদ (৫৮), পেশা : কৃষক, গ্রাম : দহরপুর, ইউনিয়ন : দহরপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

২৬. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৬০৮-৬০৯

২৭. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ৫৪০

২৮. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ২৮০

২৯. ধুনট গণকবরে শহিদের নাম অংকিত রয়েছে।

৩০. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

৩১. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

৩২. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ২৪৩

৩৩. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ২৬৭

৩৪. মো. আবদুল মজিদ, উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডার, দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : নিজ বাসভবন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৬ মার্চ ২০১৪

৩৫. মো. আবদুল মজিদ, *প্রাগুক্ত*

৩৬. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫
http://www.thedailystar.net/bangla

৩৭. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬

৩৮. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. আব্দুস সামাদ মাস্টার, গ্রাম : চাকলমা, পো. মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৩৯. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (৬৫), পিতা : মৃত নূরুল ইসলাম মণ্ডল, মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : মালাহার, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৪০. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ১২৯

৪১. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ২৪৩

৪২. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪

৪৩. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ২৫০

৪৪. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ২৬৭

৪৫. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ২৯৩

৪৬. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: হাজী মোসলেম উদ্দিন, পিতা: মুখো প্রাং, গ্রাম: লক্ষীপুর, উপজেলা : কাহালু, জেলা: বগুড়া, তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৪৭. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: হাজী মোসলেম উদ্দিন, পিতা: মুখো প্রাং, গ্রাম: লক্ষীপুর, উপজেলা : কাহালু, জেলা: বগুড়া, তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৪৮. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: ভেলু চন্দ্র, পিতা-লক্ষন চন্দ্র, গ্রাম: গিরাইল, উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৪৯. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আজাহার আলি, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৫০. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. লফিজ উদ্দীন, পিতা : নজের কাজী, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

৫১. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: নাজের আলী, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

৫২. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আজাহার আলি, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৫৩. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: রজিব উদ্দিন, পিতা : আসতউল্লাহ, , গ্রাম: জয়তুল, উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আব্দুস সামাদ, পিতা: আব্বাস মন্ডল, গ্রাম: জয়তুল, উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৫৪. সেলিনা শিউলী, পৃ. ৫৩-৫৪

৫৫. *http://www.snn24.com/sn-4790*

৫৬. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: আনোয়ার হোসেন রানা, সম্পাদক: সাপ্তাহিক আজকের তাজা খবর, উপজেলা: নন্দীগ্রাম, জেলা: বগুড়া, তারিখ ২৩ জানুয়ারি ২০১৪

৫৭. সংগৃহিত গণসমাধি, বামণপাড়া

৫৮. সংগ্রহ : মালদা গণকবর স্মৃতিসৌধ

৫৯. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

৬০. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মোঃ লিয়াকত আলী, মুক্তিযোদ্ধা, মাঝিড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া, তারিখ: ৫ জানুয়ারি ২০১৪

৬১. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ৩৩২

৬২. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৬৩. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড পৃ. ১০৭

৬৪. সংগৃহিত : দড়িমুকুন্দ চব্বিশ শহিদিয়া কবরস্থান

৬৫. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: হাশেম আলী মণ্ডল (৬০), বাগড়া কলোনী, কুমুদী, শেরপুর, তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৭

৬৬. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: জোবেদা আক্তারের (৬০), বাগড়া কলোনী, কুমুদী, শেরপুর, তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৭

৬৭. *http://sherpur.bogra.gov.bd/site/tourist_spot*

৬৮ . স্মৃতি স্তম্ভ থেকে সংগৃহিত

৬৯. *দৈনিক বণিক বার্তা*, মার্চ ২৫, ২০১৭

৭০. সেলিনা শিউলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭

৭১. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম: মো. সাইফুল ইসলাম প্রামাণিক (৬৫), পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : মালাহার, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ৩০ আগস্ট ২০১৭

৭২. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৬০১

৭৩. মো. সিরাজুল ইসলাম (৭০), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শাহবাজপুর, ইউনিয়ন : ঘোরাপীর, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

৭৪. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ১৯৯

৭৫. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৩০৮

৭৬. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৫৫

৭৭. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৬২

৭৮. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ২৫০

৭৯. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ১৪৯

৮০. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬

৮১. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৫০৪

৮২. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৫৩২

৮৩. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৫৪৪

৮৪. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৫৭৫-৫৭৬

৮৫. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৫৯৯

৮৬. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ২৭

৮৭. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ৮২
৮৮. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ১৬২
৮৯. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ২০০
৯০. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ২২৬
৯১. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ২৪৫
৯২. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, পৃ. ৮৩
৯৩. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ১১০
৯৪. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ১৭৭
৯৫. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৩১১
৯৬. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, পৃ. ৫১৫
৯৭. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ১৫১
৯৮. *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪
৯৯. মঙ্গল কুমার চাকমা, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮
১০০. http://portal.ukbengali.com/node/96
১০১. মঙ্গল কুমার চাকমা, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮
১০২. http://portal.ukbengali.com/node/96
১০৩. http://bddistrict.info/

গ্রন্থপঞ্জি ও সাক্ষাৎকার-এর তালিকা

রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড [প্রাচীন যুগ], জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

মুহম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, সপ্তদশ সংস্করণ মে ২০১৩

এম এ হাসান, *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ*, ওয়ার ক্রাইমস্ ফ্যাক্টস্ ফাইন্ডিং কমিটি জেনোসাইড আর্কাইভ এন্ড হিউম্যান স্টাডিস সেন্টার, ঢাকা, ২০০১

সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

সাঈদ বাহাদুর, *গণহত্যা ও বধ্যভূমি ৭১*, মুক্তচিন্তা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৭

সেলিনা শিউলী, *বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯

মামুন রশীদ, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস : বগুড়া জেলা*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০১৭

সম্পাদিত গ্রন্থ

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*- দ্বিতীয় খন্ড, সময়, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, নবম খণ্ড, সময়, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দশম খণ্ড, সময়, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, একদশ খণ্ড, সময়, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বাদশ খণ্ড, সময়, ঢাকা, ২০১৩

ব্যবহৃত দলিলপত্র

আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১*, (ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, [সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত], ২০১১

পত্রিকা

দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪

ঐ, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫

ঐ, ১১ ডিসেম্বর ২০১৬

দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৯ মার্চ, ২০১৪

ঐ, ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর ২০১২

বাংলা ট্রিবিউন, মার্চ ০৫, ২০১৭

ঐ, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১৭

দৈনিক বণিক বার্তা, মার্চ ২৫, ২০১৭

বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৮ ডিসেম্বর, ২০১৬

অনাবিল সংবাদ, ডিসেম্বর ১২, ২০১৫

নিউজ নাইন, প্রচার : ০৩ এপ্রিল ২০১৬

গবেষণা প্রবন্ধ

আহম্মেদ শরীফ, 'গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর ১৯৭১: পরিপ্রেক্ষিত নীলফামারী', *স্থানীয় ইতিহাস*, সংখ্যা ১৪, ২০১৫ : 'বগুড়া ১৯৭১ : গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবর', *ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ ॥* ৩, ২০১৬

মামুন সিদ্দিকী, 'কুমিল্লা ১৯৭১: গণহত্যা, গণকবর ও বধ্যভূমির পরিচয়', *স্থানীয় ইতিহাস*, সংখ্যা ১৪, ২০১৫

হোসনে আরা, '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতন ও গণহত্যা : পরিপ্রেক্ষিত বগুড়া', *Clio*, Jahangirnagar University Journal of the Department of History, Vol.XXXII, June 2015, P. 67

প্রবন্ধ

আবুল কাশেম ফকির, 'পাকিস্তানি সেনাদের ৪শ অস্ত্র দখল করি', *কালের কণ্ঠ*, ২২ মার্চ, ২০১৭

গাজীউল হক, 'সশস্ত্র প্রতিরোধ বগুড়া', *যুদ্ধদলিল.কম*, ২১ আগস্ট ১৯৮৩

ইব্রাহিম হোসেন, 'মা ভেবেছিল আমি যুদ্ধে মারা গেছি', *কালের কণ্ঠ*, ৮ ডিসেম্বর, ২০১৬

ব্যবহৃত ওয়েবসাইটসমূহ

eBanglaPedia

bn.banglapedia.org/index.php?titleপুণ্ড্রবর্ধন

http://bn.banglapedia.org/index.php?

http://www.sadar.bogra.gov.bd/site/page/ae79

http://sadar.bogra.gov.bd/site/page/e80792d8-1ab0-11e7-8120-286ed488c766

http://sherpur.bogra.gov.bd/site/tourist_spot

http://www.banglanews24.com/national/news/bd/449462.details#3

http://www.kalerkantho.com/home/printnews/163146/2014-12-15

https://www.youtube.com/watch?v=IV8k767M4nA

http://ajkerpatrika.com/sarabangla/2015/12/07/61823

http://www.dainikamadershomoy.com/bangladesh/45769/

http://www.thedailystar.net/bangla

http://sadar.bogra.gov.bd/site/top_banner/8df362b5-1ab1-11e7-8120-286ed488c766

http://zuddhodolil.com

http://www.sadar.bogra.gov.bd/site/page/ae79

http://muktijuddho-bogra.blogspot.com/2015/11/blog-post.html

http://bddistrict.info

www. facebook.com/akbar1999.20feb

সাক্ষাৎকার

মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (৬৫), পিতা : মৃত নূরুল ইসলাম মণ্ডল, মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : মালাহার, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

মো. হামিদ আলী (৬৬), পিতা : মনুশাহ, গ্রাম: সরলপুর, ইউনিয়ন : গোকুল, উপজেলা : বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

লিয়াকত আলী, গ্রাম : বৃ-কুষ্টিয়া, ইউনিয়ন : আড়িয়াবাজার, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৮ আগস্ট ২০১৭

আলহাজ্ব মোঃ মমতাজ উদ্দিন, পিতা: মোবারক আলী, মাতা: গোফুরুন নেসা, পেশা: ব্যবসা, ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা: কাটনারপাড়া, ডাকঘর/উপজেলা: বগুড়া, ১৬ এপ্রিল ২০১৭

বজলুর প্রামাণিক (৫৮), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শলিগ্রোম, ইউনিয়ন : ছাতিনগ্রাম, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

অ্যাড. রেজাউল করিম মন্টু, পিতার নাম: মৃত ইমারত আলী, পেশা: আইনজীবী, সাক্ষৎকার গ্রহণের স্থান: জলেশ্বরীতলা, বগুড়া, ২৫ মার্চ ২০১৪

মো. হামিদ আলী (৬৬), পিতা : মনুশাহ, গ্রাম: সরলপুর, ইউনিয়ন : গোকুল, উপজেলা : বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

হামিদুল ইসলাম ফটিক, ধুনট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার (ডেপুটি), ধুনট, বগুড়া, তারিখ : ৩০ জুন ২০১৭

মো. আব্দুস সামাদ মাস্টার, গ্রাম : চাকলমা, পো. মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭

মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (৬৫), পিতা : মৃত নূরুল ইসলাম মণ্ডল, মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : মালাহার, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

হাজী মোসলেম উদ্দিন, পিতা: মুখো প্রাং, গ্রাম: লক্ষীপুর, উপজেলা : কাহালু, জেলা: বগুড়া, তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৭

ভেলু চন্দ্র, পিতা-লক্ষন চন্দ্র, গ্রাম: গিরাইল, উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া, তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৭

আজাহার আলি, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৭

মো. লফিজ উদ্দীন, পিতা : নজের কাজী, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

নাজের আলী, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

মো. লফিজ উদ্দীন, পিতা : নজের কাজী, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

রজিব উদ্দিন, পিতা : আসতউল্লাহ, , গ্রাম: জয়তুল, উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

আব্দুস সামাদ, পিতা: আব্বাস মন্ডল, গ্রাম: জয়তুল, উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া, তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৭

মো. কায়েস উদ্দিন (৮৮), পিতা : মহোরআলী প্রমানিক, গ্রাম : মির্জাপুর, ইউনিয়ন : ভট্টরা, থানা : নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া, তারিখ: ২২ জুলাই ২০১৭

আনোয়ার হোসেন রানা, সম্পাদক: সাপ্তাহিক আজকের তাজা খবর, উপজেলা: নন্দীগ্রাম, জেলা: বগুড়া, তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৭

আলহাজ্ব মো. হাবিবুর রহমান (৬৭), পেশা : ব্যবসায়ী, লিচুতলা, বগুড়া সদর, বগুড়া, তারিখ : ২১ জুলাই ২০১৭

ওবায়দুর রহমান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শেরপুর, জেলা: বগুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : সাতমাথা পোস্ট অফিসের সামনে, তারিখ : ২৭ জুন ২০১৭

আব্দুল বারী, শিবগঞ্জ থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, বগুড়া, তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬

মো. সাইফুল ইসলাম প্রামাণিক (৬৫), পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : মালাহার, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ৩০ আগস্ট ২০১৭

আব্দুল হামিদ (৫৮), পেশা : কৃষক, গ্রাম : দহরপুর, ইউনিয়ন : দহরপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

বজলুর প্রামাণিক (৫৮), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শলিগ্রোম, ইউনিয়ন : ছাতিনগ্রাম, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

মো. আবু তাহের (৬৬), অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী ও মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : ধনতলা, ইউনিয়ন : নশরতপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

আব্দুল হামিদ (৫৮), পেশা : কৃষক, গ্রাম : দহরপুর, ইউনিয়ন : দহরপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

মো. সিরাজুল ইসলাম (৭০), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শাহবাজপুর, ইউনিয়ন : ঘোরাপীর, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

মো. সিরাজুল ইসলাম (৭০), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শাহবাজপুর, ইউনিয়ন : ঘোরাপীর, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

অ্যাড. মকবুল হোসেন মুকুল, পিতার নাম: মৃত সৈয়দ আলী মন্ডল, পেশা: আইনজীবী, মহলা: বাদুরতলা, ডাকঘর/ উপজেলা: বগুড়া, জেলা: বগুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : বগুড়া কোর্ট, ২৫ মার্চ ২০১৪

আব্দুল কাদের , উপজেলা কমান্ডার: বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৭ মে ২০১৪

আলহাজ্ব মো. হাবিবুর রহমান (৬৭), পেশা : ব্যবসায়ী, লিচুতলা, বগুড়া সদর, বগুড়া, তারিখ : ২১ জুলাই ২০১৭

মো. হামিদ আলী (৬৬), পিতা : মনুশাহ, গ্রাম: সরলপুর, ইউনিয়ন : গোকুল, উপজেলা : বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

মো. আবদুল মজিদ, উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডার, দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : নিজ বাসভবন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৬ মার্চ ২০১৪

হাশেম আলী মণ্ডল (৬০), বাগড়া কলোনী, কুমুদী, শেরপুর, তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৭

জোবেদা আক্তারের (৬০), বাগড়া কলোনী, কুমুদী, শেরপুর, তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৭

হাশেম আলী মণ্ডল (৬০), বাগড়া কলোনী, কুমুদী, শেরপুর, তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৭

ওবায়দুর রহমান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শেরপুর, জেলা: বগুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : সাতমাথা পোস্ট অফিসের সামনে, ২৭ মে ২০১৪

মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (৬৫), পিতা : মৃত নূরুল ইসলাম মণ্ডল, মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : মালাহার, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

আব্দুল হামিদ (৫৮), পেশা : কৃষক, গ্রাম : দহরপুর, ইউনিয়ন : দহরপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

হাজী মো: মোজাম্মেল হক (৬৭), অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম : পূর্ব ডালম্বা, ইউনিয়ন : নশরতপুর, উপজেলা : আদমদীঘি, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৭

মো. সিরাজুল ইসলাম (৭০), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শাহবাজপুর, ইউনিয়ন : ঘোরাপীর, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

মো. সিরাজুল ইসলাম (৭০), পেশা : কৃষক, গ্রাম : শাহবাজপুর, ইউনিয়ন : ঘোরাপীর, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৯ আগস্ট ২০১৭

আলহাজ্ব মোঃ তোজাম্মেল হোসেন, বগুড়া শহর আওয়ামী লীগের ২০ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন সভাপতি, বয়স-প্রায় ৭৫, সাক্ষাৎকারের স্থান : নিজ বাসভবন, বগুড়া, তারিখ : ২৮ জুলাই ২০১৭

মোঃ জালাল উদ্দীন, ধুনট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, ধুনট, বগুড়া, তারিখ: ৩০ মে ২০১৪

মো. হেলাল উদ্দীন (৬০), পেশা : ব্যবসা, ফুলবাড়ী, বগুড়া সদর, বগুড়া, তারিখ : ২১ জুলাই ২০১৭

আব্দুল কাদের , উপজেলা কমান্ডার: বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, তারিখ : ২৭ জুলাই ২০১৭

হুমায়ন আলম চান্দু, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার গাবতলী থানা, গাবতলী, বগুড়া, তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৭

মো. আব্দুল বারি (৭০), পেশা : সাধুবাবা, গ্রাম : ঝাউপাড়া, ইউনিয়ন : ময়দানহাটা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, বগুড়া, তারিখ : ৩১ আগস্ট ২০১৭ ।